হাকিমুল উম্মত মাওলানা
আশরাফ আলি থানভি *রচিত*

মুফতি মোহাম্মদ জায়েদ মাজাহেরি নাদভি *সংকলিত*
আতাউর রহমান খসরু *অনূদিত*

'মাহফিল'/'দিলরুবা' কর্তৃক সম্পাদিত

সংকলকের কথা

মুফতি মোহাম্মদ জায়েদ মাজাহেরি নাদভি

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ– মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ সবার জীবনে বিয়ে-শাদি আসে। বর্তমানে বিয়ে নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। ধনী-দরিদ্র, ধর্মমুখী-ধর্মহীন সবাই বিয়ে নিয়ে চিন্তিত। বিয়ে-শাদিকেই মানবজীবনের সবচেয়ে বড়ো চিন্তার কারণ মনে করা হয়। দরিদ্রের প্রসঙ্গ না হয় বাদই দিলাম, ধনীর বিয়েতে যা কিছু হয় এবং যে পরিমাণ ঝামেলা পোহাতে হয়, তা তারাই ভালো জানে।

ইসলাম বিয়েকে সবচেয়ে ঝামেলামুক্ত সহজ কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছে। হজরত রাসুলেকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও হজরত সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] ঝামেলামুক্ত সহজ বিয়ের দৃষ্টান্তস্থাপন করে গেছেন। অথচ আজ বিয়ে সবচেয়ে কঠিন ও ঝামেলার কাজে পরিণত হয়েছে।

বিয়ে মূলত একটি আনন্দের বিষয় কিন্তু আজ তা বিপদ ও দুশ্চিন্তার উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতো যুবতী গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করছে, কতোজন আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিচ্ছে আর কতো ধনীপিতা কন্যাসন্তান জন্মের কথা শুনে তেলে-বেগুনে গরম হয়ে উঠছে; শুধু কন্যাসন্তান প্রসবের অপরাধে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে। পরিতাপের বিষয়! এ যুগেও কন্যাসন্তান প্রসব করা বিপদের কারণ ও অপরাধ রয়ে গেছে।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

"তাদেরকে যখন কন্যাসন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন রাগে তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়।"

প্রাক-ইসলামযুগে কাফেরদের যেঅবস্থা ছিলো আজকের পরিস্থিতি তার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। এর একমাত্র কারণ, মেয়ে হওয়া মানেই এখন তাকে বিয়ে দেয়ার ঝামেলা পোহাতে হবে। আর বিয়ে মানে ভূরিভোজ। মেয়ের পাত্র নির্বাচন ও তার মাপকাঠি নির্ধারণ, মেয়ে সাজিয়ে দেয়ার চিন্তা, বংশ ও বংশের লোকদের সন্তুষ্টি, তাদেরকে দাওয়াতপ্রদানে সতর্কতা, বিভিন্ন সামাজিক প্রচলন রক্ষা করা, বিয়েতে পানির মতো পয়সা উড়ানো এখন আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দরিদ্রমানুষের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? শুধু দরিদ্র কেনো ধনাঢ্যব্যক্তিরাও এ ধরনের ঝামেলা থেকে রেহাই পান না। মোটকথা, বিয়ে-শাদি নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আজ অস্থির ও চিন্তিত। কারণ, আমরা বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা, শরিয়তের শিক্ষা, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও সাহাবায়ে কেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম]-এর আদর্শ ও দৃষ্টান্ত ভুলে গেছি। বিয়ের সময় আমরা খেয়াল করি না বিয়ের ইসলামি রীতি কী। বিয়ের সময় রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কর্মপন্থা ও আদর্শ কী। যখন ইসলামি শরিয়ত পূর্ণতালাভ করেছে এবং যেধর্মে শুধু ইবাদত নয় বরং লেনদেন ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে নির্দেশনা পাওয়া যায় তখন একজন দীনদার মুসলমান কীভাবে তা থেকে বিমুখ হতে পারে। কেননা দীন শুধু নামাজ পড়া আর রোজা রাখার নাম নয় বরং বিয়ে-শাদিও ইবাদত ও দীনের অংশ। এ ক্ষেত্রেও রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর আদর্শ অনুসরণ করা আবশ্যক।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তমআদর্শ।"

আজ রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর উত্তমআদর্শ পরিহার করার কারণেই সমস্ত পৃথিবীতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আজ দীন-শরিয়তের পরিবর্তে মানবরচিত প্রচলনকেগ্রহণ করা হয়েছে। যার কারণে আমাদের পরকালতো নষ্ট হয়েছেই ইহকালও নষ্ট হয়েছে। আরো কতোরকম অস্থিরতা আমাদের জীবনকে গ্রাস করেছে।

বিয়ে-শাদি বিষয়ে শরিয়তবেত্তা মনীষীগণও বিভিন্ন বই লিখেছেন।

'ইসলামি বিয়ে'তে কোরআন-হাদিস ও যুক্তির আলোকে বিয়ের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিয়ের ধর্মীয় উপকারিতা, সম্পদ ও বংশের বিবেচনা, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও তার ভিত্তি, বরযাত্রী, যৌতুক, ওলিমা [বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] ইত্যাদি প্রচলন সম্পর্কে বিস্তারিত ও গঠনমূলক আলোচনা পাবেন। এই বইটি মূলত হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর বিভিন্ন বাণী, উপদেশ, রচনার নির্বাচিত একটি সংকলন। অধম যা অনেক পরিশ্রম করে বিন্যস্ত করেছে। আল্লাহর দরবারে আশা, বিয়ে বিষয়ে বইটি অত্যন্ত গঠনমূলক ও উপকারী হবে।

যারা কোরআন ও হাদিসের নীতি-আদর্শ মেনে বিয়ে করবে তারা পৃথিবীতেও সুখ-শান্তিতে জীবনযাপন করবে পরকালেও উত্তম প্রতিদানলাভ করবে। অমুসলিমরাও যদি ইসলামের নীতি অনুসরণ করেন তবে তারা জাগতিক সুখলাভ করবে। বইটি ঘরে ঘরে ও প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের হাতে পৌঁছানো প্রয়োজন। যেহেতু মানুষ উর্দুভাষা সম্পর্কে কম জানেন তাই অন্যভাষায় অনূদিত হলে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবে। আল্লাহতায়ালা এই সংকলনটি গ্রহণ করুন এবং তা মুসলিমজাতির সংশোধন ও হেদায়েতের জন্য নিয়ামক করুন! আমিন!!

সূচি

অধ্যায় ॥ ১ ॥

● বিয়ের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

অধ্যায় ॥ ২ ॥

● স্ত্রীর গুরুত্ব ও উপকারিতা

অধ্যায় ॥ ৩ ॥

● বিধবানারীর আলোচনা

অধ্যায় ॥ ৪ ॥

● কুফু বা সমতাবিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অধ্যায় ॥ ৫ ॥

• পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অধ্যায় ॥ ৬ ॥

• বিয়ের আগে দোয়া ও ইস্তেখারার প্রয়োজনীয়তা

অধ্যায় ॥ ৭ ॥

• প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সংশোধন

প্রথম পরিচ্ছেদ

অধ্যায় ॥ ১১ ॥

অধ্যায় ॥ ১২ ॥

অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

অধ্যায় ॥ ২০ ॥

অধ্যায় ॥ ২১ ॥

অধ্যায় ॥ ২২ ॥

অধ্যায় ॥ ২৩ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস

১. "হজরত আবুনাজি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, তোমাদের মধ্যে যেব্যক্তি বিয়ের সামর্থ রাখে অথচ বিয়ে করে না তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" [তারগিব]

২. "হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যখন কোনো বান্দা বিয়ে করলো তখন তার দীনদারির [ধর্মপালনের] অর্ধেক পূর্ণ করলো। এখন বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় পাওয়া প্রয়োজন।" [তারগিব]

৩. "হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণদানে সক্ষম তার বিয়ে করে নেয়া উচিত। কেননা বিয়ে দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান পবিত্র রাখে। আর যে ভরণ-পোষণদানে সক্ষম নয় সে যেনো রোজা রাখে। কেননা রোজা তার জন্য পৌরষহীনতার মতো [উত্তেজনা প্রশমিত করে]।"

[মেশকাত, ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৫৮]

বিয়ের জাগতিক ও পরকালীন উপকারিতা

৪. হজরত আবুনাজি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, মুখাপেক্ষী! মুখাপেক্ষী! ওইপুরুষ যার স্ত্রী নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেন, যদি তার অনেক সম্পদ থাকে তবুও কি সে মুখাপেক্ষী?

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'যদিও তার অনেক সম্পদ থাকে তবুও সে মুখাপেক্ষী।

তিনি আরো বলেন, মুখাপেক্ষী! মুখাপেক্ষী! ওইনারী যার স্বামী নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেন, যদি তার অনেক সম্পদ থাকে তবুও কি সে মুখাপেক্ষী? রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'যদিও তার অনেক সম্পদ থাকে তবুও সে মুখাপেক্ষী।" [রাজিন]

কেননা সম্পদের উপকারিতা, প্রশান্তি বা পার্থিব চিন্তামুক্ত থাকা সেই পুরুষের ভাগ্যে জুটে না যার স্ত্রী নেই। সে নারীর ভাগ্যেও জুটে না যার স্বামী নেই। বাস্ত ব অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বিয়েতে জাগতিক ও পরকালীন অনেক বড়ো বড়ো উপকার রয়েছে। [হায়াতুল মুসলিমিন; পৃষ্ঠা: ১৮৭]

বিয়ে আল্লাহর বিশেষ দান বা উপহার। বিয়ের দ্বারা জাগতিক ও ধর্মীয় জীবন দুটোই ঠিক হয়ে যায়। মন্দচিন্তা ও অস্থিরতা থাকে না। সবচেয়ে বড়ো উপকার হলো, অঢেল পুণ্য অর্জন। কেননা স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসে ভালোবাসার কথা বলা, খুনসুটি করা নফল নামাজ পড়ার চেয়েও পুণ্যময়।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪]

৫. "হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, নারীকে বিয়ে করো' সে তোমার জন্য সম্পদ টেনে আনবে।"

পাদটীকা : সম্পদ টেনে আনার উদ্দেশ্য হলো, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই জ্ঞানসম্পন্ন এবং একে অপরের কল্যাণকামী হয়ে থাকে। স্বামী এ কথা স্মরণ রাখে– আমার দায়িত্বে খরচ বেড়ে গেছে; তখন বেশি-বেশি উপার্জন করার চেষ্টা করে। নারীও এমন কিছুব্যবস্থাগ্রহণ করে যা পুরুষগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা প্রশান্তি ও চিন্তামুক্ত হতে পারে। আর সম্পদের মূল উদ্দেশ্যই এটি। [হায়াতুল মুসলিমিন]

৬. "হজরত মাকাল ইবনে ইয়াসার [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, তোমরা অধিক সন্তানপ্রসবকারী নারীকে বিয়ে করো। কেননা আমি তোমাদের অধিক্যতা দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো যে, আমার উম্মত এতো বেশি!"

[আবুদাউদ, নাসায়ি, হায়াতুল মুসলিমিন: পৃষ্ঠা: ১৮৯]

বিয়ে না করা ক্ষতি

৭. "হজরত আবুজর গিফারি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আক্কাফ [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বলেন, হে আক্কাফ! তোমার স্ত্রী আছে?

তিনি বলেন, 'না।'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, 'তোমার কি সম্পদ ও সচ্ছলতা আছে?'

সে বললো, 'আমার সম্পদ ও সচ্ছলতা আছে।'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, 'তুমি এখন শয়তানের ভাইদের দলভুক্ত। যদি তুমি খ্রিস্টান হতে তবে তাদের রাহেব [পাদ্রী] হতে। নিঃসন্দেহে বিয়ে করা আমাদের ধর্মের রীতি। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওইব্যক্তি যে অবিবাহিত। মৃতব্যক্তিদের মধ্যেও নিকৃষ্টব্যক্তি যে অবিবাহিত। তোমরা কি শয়তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও? শয়তানের কাছে নারীর চেয়ে ভয়ংকর কোনো অস্ত্র নেই। যা ধর্মভীরু মানুষের ওপরও কার্যকরী। তারাও নারীসংক্রান্ত ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যারা বিয়ে করেছে তারা নারীর ফেতনা থেকে পবিত্র। নোংরামি থেকে মুক্ত।'
এরপর বলেন, 'আক্কাফ! তোমার ধ্বংস হোক। তুমি বিয়ে করো নয়তো তুমি পশ্চাৎপদ মানুষের মধ্যে থেকে যাবে।"
[মোসনাদে আহমাদ, জামেউল ফাওয়ায়েদ, ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৫৭]

বিয়ে একটি ইবাদত ও ধর্মীয় বিষয়

যেকাজের প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে তথা ওয়াজিব; অথবা যেকাজে উৎসাহপ্রদান করা হয়েছে তথা মোস্তাহাব; বা যেকাজের বিনিময়ে সোয়াব প্রদানের অঙ্গীকার এসেছে তা ধর্মীয়কাজ। আর যেকাজের ব্যাপারে এমনটি বলা হয়নি তা জাগতিক কাজ। এই ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হবে যে, বিয়ে ধর্মীয়কাজ। কেননা শরিয়ত কখনো বিয়ের জোর তাগিদ দিয়েছে, কখনো উৎসাহ দিয়েছে। কখনো সোয়াবের অঙ্গীকার করেছে। উপরন্তু বিয়ে না করার প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করেছে। এটা বিয়ে ধর্মীয়কাজ হওয়ার প্রমাণ। এ কারণ ফকিহ বা ধর্মবেত্তা মনীষীগণ বিয়ের যে প্রকার ও বিধান বর্ণনা করেছেন সেখানে বিয়ে মোবাহ [যা করলে পুণ্য বা পাপ কোনোটাই হয় না] হওয়ারও কোনো স্তর বর্ণনা করেননি। এটা ভিন্ন কথা যে, কোনো কারণবশত কখনো কখনো বিয়ে করা শরিয়তের দৃষ্টিতে মাকরুহ [অনুচিত]। প্রকৃতপক্ষে বিয়ে করা ইবাদত। ইবাদত বলেই ধর্মবেত্তা মনীষীগণ ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ করা, অন্যকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া এবং নীরবে আল্লাহর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম বলেছেন।
[ফতোয়ায়ে শামি, ইমদাদুল ফতোয়া]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ে একটি লেনদেন তবে তা জাগতিক অর্থে নয়

রোজা– যা ইবাদত হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত; কোনো কোনো অবস্থাতে তাতেও শাস্তির বিধান প্রদান করা হয়। শরিয়তের নীতি-নির্ধারকগণ কাফফারার রোজার [যে রোজা পাপমোচনের নিমিত্তে রাখতে হয়] ক্ষেত্রে যেমনটি বলেছেন। তারপরও কেউ রোজাকে জাগতিক বিষয় বলে না। তাহলে বিয়ের 'লেনদেন' বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে জাগতিক বিষয় বলা হবে কেনো? বরং ভাবার বিষয় হলো, লেনদেনের বিপরীতে শাস্তির বিধান ইবাদতের তুলনায় অনেক দূরের। যখন ইবাদতের বিপরীতে শাস্তির বিধান আসার পরেও তা জাগতিক হয় না তাহলে ইবাদতে [বিয়েতে] 'লেনদেন' বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়াতে তা জাগতিক হয়ে যাবে না। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২; পৃষ্ঠাঃ ২৬৮]

বিয়ের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

পবিত্রকোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন–

خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"আল্লাহপাক তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া [সঙ্গী] সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের থেকে শান্তিলাভ করো। আর তিনি তোমাদের মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও দয়ার্দ্রতা।"
অন্যত্র বলেন–

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

"তোমাদের স্ত্রীগণ (সন্তান উৎপাদনের জন্য) তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ।"

১. স্ত্রীকে বানানো হয়েছে পুরুষের আরাম ও শান্তির জন্য। বিষণ্ণতা, দুঃশ্চিন্তা ও নানা কর্মব্যস্ততার মাঝে স্ত্রী শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম। মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের অনুরাগী। স্ত্রীর সঙ্গে মানুষের বিরল ও আশ্চর্য ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়।
মেয়েরা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। সন্তানপ্রতিপালন, গৃহব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল ও সবকাজের শ্রেষ্ঠ সহযোগী। ফলে তার সঙ্গে ভালোব্যবহার করতে হবে। স্ত্রী ইজ্জত, সম্মান, সম্পদ ও সন্তান সংরক্ষণকারী ও এর পরিচালক। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সম্পদ, সম্মান ও দীনের সংরক্ষণ করে।

২. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে জৈবিকচাহিদা বা কামভাবের অধিকারী। স্ত্রী পুরুষের কাম-চাহিদা পূরণ করে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ।' তারা বীজ উৎপাদনের উপযোগী। যেভাবে ক্ষেতের সেবা-যত্ন করা হয় এবং তার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তেমনিভাবে স্ত্রীরও বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে যা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।

৩. নারীর প্রতি পুরুষের যে আগ্রহ ও চাহিদা রয়েছে এবং পুরুষের প্রতি নারীর যে আগ্রহ ও চাহিদা রয়েছে তা প্রাকৃতিক। বিয়ের মাধ্যমে তা পূরণ করলে মানুষের অন্তরে প্রকৃত ভালোবাসা ও পবিত্র চিন্তা-চেতনা তৈরি হয়। আর অবৈধভাবে পূরণ করা হলে তা মানুষকে অপবিত্র জীবনের প্রতি নিয়ে যায়। অন্তরে নোংরা চিন্তা ও কল্পনা সৃষ্টি করে। সুতরাং বিয়ে পবিত্র জীবনের অনুগামী করে এবং নোংরা জীবন থেকে ফিরিয়ে রাখে। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ১৯২]

বিয়ে করবে কোন নিয়তে

৪. পবিত্র কোরআনে বিয়ের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, সংযম ও পবিত্রতা অর্জন করা, শারীরিক সুস্থতা ও বংশধারা ঠিক রাখা ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য হলো, সংযম ও সুসন্তান লাভ করা। যেমন বলা হয়েছে–

مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ

"তোমরা সংযম ও পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিয়ে করো। শুধু যৌনচাহিদা মেটাতে বিয়ে করো না।"

৫. অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ

"(সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা) সন্তান কামনা করো। আল্লাহ যা তোমাদের ভাগ্যে রেখেছেন।"

৬. বিয়ে করলে মানুষের জীবন একটি রুটিনের মধ্যে চলে আসে। সে নিয়মানুবর্তী হয়, অধিক উপার্জনের চিন্তা করে, অযথা কাজ করে না; তার মধ্যে ভালোবাসা, লজ্জা, আনুগত্য সৃষ্টি হয়। মানুষ সমৃদ্ধ ও সুস্থ জীবনযাপন করে।

৭. বিয়ে সুস্থতা, আত্মপ্রশান্তি, আনন্দমুখর সুখী জীবন ও উভয় জগতে সফলতালাভের মাধ্যম।

৮. বিয়ে মানবসভ্যতার জন্য আল্লাহর অনন্য উপহার। দেশপ্রেমের শক্তভিত্তি। দেশ ও জাতির উচ্চতর সেবা। নানারকম রোগ-বালাই থেকে বেঁচে থাকার কার্যকরী মাধ্যম বা পথ্য। আল্লাহতায়ালা যদি মানবসমাজে বিয়ের বিধান দান

না করতেন তবে পৃথিবী আজ বিরান হয়ে যেতো। না কোনো মানুষ বা সমাজ থাকতো; না কোনো বসতি বা বাগান থাকতো।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা লিল আহকামিল নকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ১৯৫]

বিয়ের উপকারিতা

মানুষের ভেতরে যে জৈবিক চাহিদা থাকে যদি তা পূরণের একটি বৈধ মাধ্যম না থাকে তবে সে তা যথেচ্ছা পূরণ করবে। তার থেকে নির্লজ্জতা প্রকাশ পাবে। এজন্য শরিয়ত বিয়ে বৈধ করে মানুষের জৈবিকচাহিদাপূরণের একটি বৈধমাধ্যম নির্ধারণ করেছে। বিয়ের বৈধতা প্রমাণ করে শরিয়ত মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের তুলনায় অধিক কল্যাণকামী।

বিবেকের কাছে প্রশ্ন করা হলে বিবেক বিয়েকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেবে না। কেননা একজন অপরিচিত পুরুষের সামনে একজন নারী কীভাবে বিবস্ত্র হবে? বিবেকের বিচারে যা সম্পূর্ণ নিন্দনীয়। তবে বিবেকের এই বিচারকে গুরুত্ব দিলে বা সে অনুযায়ী কাজ করলে অনেক রকম বিশৃংখলা বেড়ে যাবে। এখন একজন অপরিচিত নারী-পুরুষ বিবস্ত্র হচ্ছে। জানা নেই তখন কতো নারী-পুরুষ পরস্পরের সামনে বিবস্ত্র হবে। কেননা একজন নারী বা পুরুষ কতোক্ষণ ধৈর্যধারণ করতে পারবে? নিজেদের কামচাহিদা দমন করে রাখবে? এই পরিণতির দিকে লক্ষ রেখে ইসলামিশরিয়ত বিয়ে অনুমোদন করেছে। যাতে মানুষের চাহিদাপূরণের নির্ধারিত মাধ্যম থাকে। সমাজে বিশৃংখলা ছড়িয়ে না পড়ে। ইসলামিশরিয়ত খোদাপ্রদত্ত-ঐশী হওয়ার প্রমাণ হলো, তার দূরদৃষ্টি সর্বদা পরিণতির দিকে। যে আইন ও নিয়ম মানুষের মেধাপ্রসূত তার দৃষ্টি পরিণতিতে আবদ্ধ থাকে না। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ১৫৪, রফউল আলবাস]

স্বাভাবিকভাবে বিবেক লজ্জাশীল হওয়া কামনা করে। আর বিয়ে নির্লজ্জ বলে মনে হয়। কিন্তু শরিয়ত বিয়ের বিধান প্রণয়ন করেছে লজ্জাকে রক্ষা করতে। কারণ যদি একজায়গায়ও মানুষ লজ্জা পরিহার না করে তবে সমগ্র মানবসভ্যতা নির্লজ্জ হয়ে যাবে। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ১৫৬]

ইসলামিবিধান

হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ

"যারা বিয়ের সামর্থ রাখে তারা যেনো বিয়ে করে নেয়। কেননা তা দৃষ্টি অধিক অবনত করে, লজ্জাস্থান অধিক সংরক্ষণ করে। তথা দৃষ্টি ও সতীত্ব রক্ষা সহজ করে দেয়।"

সাধারণত বিয়ে করলে সুস্থপ্রকৃতির মানুষের জন্য সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা সহজ হয়ে যায়। যারা নোংরা প্রকৃতির অধিকারী; যারা এক বিয়ে, দুই বিয়ে, চার বিয়ে করেও পবিত্র জীবনে অভ্যস্ত হতে পারে না বরং 'মোতয়া বিয়ে'তে [টাকার বিনিময়ে সাময়িকভাবে বিয়ে করা। পূর্বআরবে এর প্রচলন ছিলো। ইসলাম পরে এটি হারাম করে। এটি ব্যভিচারের মতোই হারাম।] লিপ্ত হয় তাদের আলোচনা এখানে করা হয়নি। কারণ, এখানে মানুষের আলোচনা করা হয়েছে কোনো পশু বা বাঁদরের আলোচনা করা হয়নি। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৫৭]

বিয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

"আল্লাহর অসীমত্বের নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের উপকারের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের থেকে শান্তিলাভ করো। তিনি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও সহানুভূতি।" [বয়ানুলকোরআন]

নারীকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তাদের মাধ্যমে তোমাদের মন শান্ত ও স্থির হয়। হৃদয় আপ্লুত হয়। স্ত্রীরা পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য। আমি বলি, ভালোবাসার সময় যৌবনকাল। এ সময় উভয়ের মধ্যে আবেগ থাকে। সহানুভূতির সময় উভয়ের বৃদ্ধকাল। বাস্তবেও দেখা গেছে, বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী বা স্বামী ছাড়া কেউ পাশে থাকে না। [নুসরাতুন নিসা, হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৫৫১]

বিয়ের ভ্রান্তউদ্দেশ্য

নারীদের জানা-ই নেই যে, বিয়ের উদ্দেশ্য ভরণ-পোষণ না-কি বৈবাহিকজীবনের কল্যাণ? যদি খাওয়া-পরার সংস্থান হওয়া বিয়ের উদ্দেশ্য হতো, তবে তারা বিয়ে করতো না যারা খাওয়া-পরায় স্বচ্ছল বা যে নারীরা ধনী। অথচ রাজার মেয়েও বিয়ে করে। ফলে বুঝা গেলো, বিয়ের উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীর কল্যাণ। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৪]

বিয়ের সবচেয়ে বড়োউদ্দেশ্য

বিয়ের সবচেয়ে বড়োউদ্দেশ্য সন্তানলাভ করা। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ

"তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো যারা অধিক সন্তান প্রসব করে এবং অধিক ভালোবাসে। কেননা কেয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা আমি অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করবো।" [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৭]

বিয়ে সম্মান অর্জনের মাধ্যম

পোশাক যেমন মানুষের শোভা বা সৌন্দর্য তেমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীর জন্য শোভা। স্ত্রীও স্বামীর জন্য শোভা। স্ত্রী স্বামীর জন্য শোভা বা সৌন্দর্য এভাবে যে, স্ত্রী-সন্তান থাকলে মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখে। কারো কাছে ধার বা আর্থিক সাহায্য চাইলে সহজে পায়। কারণ, মানুষ জানে সে একা নয়। বরং তার সঙ্গে আরো দু'-একজন মানুষের রুটি-রুজি সম্পৃক্ত। তাকে সাহায্য না করলে তাদের কী হবে। অবিবাহিত মানুষকে সহজে ঋণ দেয়া হয় না। দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতেও সে কম সম্মানের অধিকারী।

বিবাহিতপুরুষকে মানুষ চরিত্রহীন মনে করে না। তাদের থেকে নিজের স্ত্রী-সন্তানকে নিরাপদ মনে করে। অবিবাহিতপুরুষকে মানুষ লালায়িত ও চরিত্রহীন মনে করে। তাদেরকে নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্য হুমকি মনে করে।

এমনিভাবে স্বামীর দ্বারা স্ত্রীরও সম্মান বাড়ে। মেয়েদের বিয়ে হলে মানুষ তাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ করে না। স্বামী পাশে থাকুক বা দূরে থাকুক যতো সন্তান হবে তা স্বামীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। তাছাড়া বিয়ের আগপর্যন্ত মেয়েদের ইজ্জত-অনিরাপদ থাকে। [রফউল ইলবাস: পৃষ্ঠা: ১৬৫]

অবিবাহিত থাকার ক্ষতি

বিয়ে পোশাকতুল্য হলে অবিবাহিত থাকা উলঙ্গ থাকার নামান্তর। বিয়েকে পোশাকতুল্য বলার উদ্দেশ্য এ কথা বুঝানো, সামর্থ থাকার পরও কোনো নারী-পুরুষের জন্য অবিবাহিত থাকা দোষণীয়। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৬৬]

যেহেতু বিয়ের অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই বিয়ে না করলে বিভিন্ন ফেতনা বা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। নানা কুমন্ত্রণা ও আশংকা দেখা দেয়। যা ইবাদতের স্বাদ ও স্থিরতা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। এসব আশংকা ও কুমন্ত্রণার ফলে অনেক মানুষের কাছে ইবাদত করা বোঝা মনে হয়। কেউ কেউ নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়। আবার কেউ সামাজিক সম্মানরক্ষার জন্য নারীঘটিত সম্পর্ক এড়িয়ে চললেও অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। যা নারীঘটিত সম্পর্ক থেকেও মারাত্মক অপরাধ ও পাপ। কেননা নারী পুরুষের জন্য বৈধ একটি মাধ্যম। আর পুরুষ পুরুষের জন্য সবসময় হারাম বা অবৈধ। অনেকে মূল অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকলেও তার পূর্বকাজ যেমন, চুমু

খাওয়া, স্পর্শ করা ইত্যাদি করে থাকে, যাতে মানুষের সন্দেহ না হয়। এমনকি তারা নিজেরাও তাকে স্নেহসুলভ ভালোবাসা মনে করে।

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ

"আমরা আল্লাহর কাছে সমস্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করি।" [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৪২]

অনেকে প্রয়োজন ও সামর্থ উভয় থাকার পরও বিয়ে করে না। কেউ কেউ প্রথম থেকেই বিয়ে করে না। কেউ কেউ স্ত্রী মারা গেলে বা তালাক দিলে পুনরায় বিয়ে করে না। অথচ প্রয়োজন ও সামর্থ-উভয় থাকলে বিয়ে করা ফরজ।

[ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৩৯]

নব্বই বছর বয়সে বিয়ে

শাহজাহানপুরে নব্বই বছর বয়সে একবৃদ্ধ বিয়ে করে। ছেলেরা আপত্তি জানায়। মেয়ে-পুত্রবধূরা বিরোধিতা করে বলে, আমরা সবাই আপনার সেবার জন্য আছি। এই বয়সে বিয়ের কী প্রয়োজন? সেবার জন্য আপনার সন্তানেরা যথেষ্ট। বৃদ্ধ বললো, আমার ভালো-মন্দ তোমরা কী বুঝো? তোমরা জানো না, কেউই পুরুষকে স্ত্রীর সমান শান্তি ও স্বস্তি দিতে পারবে না।

ঘটনাক্রমে বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকটির ডায়রিয়া হয়। পায়খানায় এতো দুর্গন্ধ হয় যে, পুরো বাড়িতে তা ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেমেয়ে কেউ ঘৃণায় পাশে আসলো না। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা সবাই বৃদ্ধকে ছেড়ে চলে গেলো। কিন্তু স্ত্রী তখনো সেবা করে যায়। বেচারি ক্লান্তিহীন সেবা করলো। সামান্য ঘৃণা করলো না। যদিও তার নতুন বিয়ে হয়েছিলো এবং তার বয়স কম ছিলো তবুও সে বৃদ্ধকে আগলে রাখতো। পায়ের কাছে বসে থাকতো। পায়খানা করিয়ে শরীর পরিষ্কার করে দিতো। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতো। বৃদ্ধ দিনে বিশ-পঁচিশবার পায়খানা করতো। প্রতিবার সে পরিষ্কার করতো। কাপড় ধুয়ে দিতো। তখন বৃদ্ধলোকটি বললো, আমি এই দিনটির জন্যই বিয়ে করেছিলাম। এরপর বৃদ্ধ সুস্থ হয়ে ছেলেদের ডেকে বললো, তোমরা নিজেদের সেবার অবস্থাতো দেখলে। আর এই সেবার জন্য তোমরা বলেছিলে, আপনার বিয়ের কী প্রয়োজন? এখন তোমরা বিয়ের প্রয়োজন বুঝতে পারলে? তখন যদি আমি বিয়ে না করতাম তাহলে তোমরা ছেড়ে চলে গেলে আমি একা পড়ে থাকতাম।

প্রকৃতপক্ষে, অসুস্থতায় পুত্রবধূ-কন্যা কখনো স্ত্রীর সমান উপকারে আসে না। আল্লাহতায়ালা এই শান্তি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝেই রেখেছেন। পৃথিবীর সুখ-শান্তি স্ত্রীর মাধ্যমে অর্জিত হয়।

অপর একটি ঘটনা

একবৃদ্ধ বিয়ে করেছিলো। কিন্তু তার শারীরিক অক্ষমতা থাকায় সে বিভিন্ন যৌনউত্তেজক ওষুধগ্রহণ করতো। একজন ডাক্তার তাকে অত্যন্ত গরম উত্তেজক ওষুধ দেয়। ফলে তার কুষ্ঠরোগ হয়। তার সারা শরীরে ঘা হয়ে যায়। কেউ তার পাশে যাওয়ারও কল্পনা করতো না। এমন মুহূর্তেও স্ত্রী সামান্য ঘৃণা করেনি। যেকোনো প্রয়োজনে সেবায় অপারগতা প্রকাশ করেনি। এই পবিত্র সম্পর্কের এবং একে অপরকে প্রাধান্য দেয়ার শেষ কোথায়? যে নারীর স্বামী তার কোনো মূল্যায়ন করে না, সম্পর্কও খুব হালকা-সেও তার স্বামীর যে সেবা করে অন্যকেউ এমন সেবা ও ত্যাগ স্বীকার করবে না।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৬১ ও ৫৫২; আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: পৃষ্ঠা: ২০৬]

মাওলানা ফজলুর রহমান একশো বছর বয়সে বিয়ে করেন

হজরত মাওলানা ফজলুর রহমান [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি শেষজীবনে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স একশো বছরেরও বেশি ছিলো। কারণ, তাঁর একটি ক্ষত থেকে সবসময় রক্ত ঝরতো। স্ত্রী ছাড়া অন্যকেউ তার দেখাশোনা করতে পারতো না। তার সেই স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দিনে-রাতে কয়েকবার নিজহাতে তা পরিষ্কার করে দিতো। কোনো ধরনের ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা ছিলো না। পৃথিবীর অন্যকোনো সম্পর্কের দৃষ্টান্ত এমন হতে পারে না। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৫৫৩; আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৪]

হাজি ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরেমক্কি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বৃদ্ধবয়সে দ্বিতীয় বিয়ে করেন

হজরত হাজি সাহেব [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] শেষবয়সে একটি বিয়ে করেছিলেন। কারণ, হজরতের স্ত্রী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তখন হজরত কেবল সেবার উদ্দেশে বিয়ে করেন। নতুন স্ত্রী হজরত ও প্রথম স্ত্রীর সেবা করতো। এর দ্বারা বুঝে আসে, স্ত্রী কেবল যৌনচাহিদা পূরণের জন্য নয় বরং এখানে অনেক কল্যাণ ও রহস্য রয়েছে। [নুসরাতুন নিসা: পৃষ্ঠা: ৫৫৩]

বিয়ের না করার হুঁশিয়ারি

হাদিসশরিফে এসেছে-

مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে অবিবাহিত রইলো সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

যেব্যক্তি বিয়ের চাহিদা ও সামর্থ থাকার পরও বিয়ে করলো না সে আমাদের পথের অনুসারী নয়। কেননা এটা খ্রিস্টানদের নিয়ম। তারা বিয়েকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথে বাধা এবং বিয়ে পরিহার করা ইবাদত মনে করে।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৩৮৬]

অনেকে বিয়ে না করা ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম মনে করে অথচ এটা বৈরাগ্যবাদী বিশ্বাস ও বেদাতের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়ত যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে তা পরিহার করা ইবাদত হতে পারে না।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪০]

হুঁশিয়ারির কারণ

প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করলে সমাজে নানা বিশৃংখলা ও পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে। কেননা চাহিদা দুই ধরনের- ১. প্রবল চাহিদা, ২. সাধারণ চাহিদা। মানুষের সাধারণ চাহিদা [যা স্বভাবজাত হয়] তা কখনোই শেষ হয়ে যায় না। যতোই কঠোর সাধনা করুক না কেনো, যেকোনো চিকিৎসাগ্রহণ করুক না কেনো–তা থেকে যায়। আমি সত্তর বছরের একবৃদ্ধকে দেখেছি, সে একছেলের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখতো। অথচ তার যৌনচাহিদা পূরণের ক্ষমতা ছিলো না। সে তার দিকে কামাতুর হয়ে থাকতো। আর কামচাহিদার সঙ্গে তাকিয়ে থাকা সম্পূর্ণ হারাম।

যৌনচাহিদা আত্ম-সাধনা দ্বারা শেষ হয়ে যায় না। বরং বার্ধক্য, ওষুধ ও স্বল্প আহারের দ্বারাও শেষ হয়ে যায় না। সাধনার লাভ হলো, চাহিদা হালকা হয়। চরিত্রের ওপর টিকে থাকা সহজ হয়। যদি চাহিদা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় তাহলে সাধনার সোয়াব দেয়া হবে কিসের ওপর ভিত্তি করে। সাধনার প্রতিদান তো এজন্য যে, মানুষ জাগতিক চাহিদা উপেক্ষা করে ভালোকাজে অটল থাকবে। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৫৮]

বিয়ে থেকে যারা বিরত থাকতে পারবে

যদি কেউ শরিয়তসম্মত কোনো অপারগতার কারণে বিয়ে থেকে বিরত থাকে তবে সে হাদিসের হুঁশিয়ারি থেকে ব্যতিক্রম। যেমন, শারীরিক, আর্থিক ও ধর্মীয় সমস্যা। শারীরিক ও আর্থিক সমস্যা স্পষ্ট। দীনিসমস্যা হলো, বিয়ের পর দুর্বল মনোবলের কারণে ঠিকমতো ধর্মপালন করতে না পারা বা ধর্মীয় ব্যস্ত তার কারণে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে না পারা ইত্যাদি।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৩৮৬]

মোটকথা, যদি কারো ভয় হয় সে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারবে না–তা মানবিক হোক বা আর্থিক হোক; তাহলে তার জন্য বিয়ে করা নিষেধ।

[ইসলাহে ইনকিলাব; পৃষ্ঠা: ৪০]

বিয়ের অপারগতাসম্পর্কিত হাদিস

হজরত ইবনে মাসউদ ও আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষের পতন স্বীয়-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের হাতে হবে। অর্থাৎ দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতাকে লজ্জাজনক মনে করা হবে। তাকে সাধ্যাতীত কাজ করতে বলা হবে। ফলে সে এমন কাজে লিপ্ত হবে যা তার দীনদারি তথা ধর্মনিষ্ঠা শেষ করে দেবে। পরিশেষে তার পতন হবে।"

হজরত আবু সাঈদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, একব্যক্তি তার মেয়েকে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কাছে নিয়ে এলো। সে অভিযোগ করলো, 'আমার মেয়ে বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। আপনি তাকে বিয়ে করতে বলুন!'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তার মেয়েকে বিয়ের নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'তোমার পিতার কথা মেনে নাও!'

সে বললো, 'ওই সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে করবো যতোক্ষণ না আপনি বলে দেবেন স্ত্রীর দায়িত্বে স্বামীর কী অধিকার রয়েছে।'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] অধিকারের বর্ণনা দিলে সে বললো, 'ওই সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি কখনোই বিয়ে করবো না।'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, 'মেয়েদের অনুমতি ছাড়া তাদেরকে বিয়ে করো না [যখন তারা শরিয়তের দৃষ্টিতে আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকারী হবে]।'

প্রথমহাদিসে পুরুষের অপারগতার কথা বলা হয়েছে। যা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহলো, ধর্মীয় ক্ষতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। আর দ্বিতীয় হাদিসে নারীর অপারগতার কথা বলা হয়েছে। সে মহিলার এই আত্মবিশ্বাস ও সাহস ছিলো না যে, সে স্বামীর অধিকার আদায় করতে পারবে। এজন্য রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাকে বাধ্য করেননি। এমনিভাবে কোনো বিধবা নারীর যদি আশংকা হয়, সে বিয়ে করলে তার সন্তানদের ক্ষতি হবে তবে অপর এক হাদিসের ভাষ্যমতে এটিও একটি অপারগতা। যার দরুন সে বিয়ে থেকে বিরত থাকতে পারবে। [হায়াতুল মুসলিমিন: পৃষ্ঠা: ১৯২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের ফিকহিবিধান

ওয়াজিব বিয়ে : যখন বিয়ে প্রয়োজন তথা দেহ-মনে তার চাহিদা থাকে এবং তার এই পরিমাণ সামর্থ থাকে যে, প্রতিদিনের খরচ প্রতিদিন উপার্জন করে খেতে পারে, তখন তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব। বিয়ে থেকে বিরত থাকলে গোনাহগার হবে।

ফরজ বিয়ে : যদি সামর্থ থাকার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা এতো বেশি থাকে যে, বিয়ে না করলে হারামকাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে বিয়ে করা ফরজ।

مِنَ الْفِعْلِ الْحَرَامِ اَلنَّظَرُ الْمُحَرَّمُ وَالْاِسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ

"কুদৃষ্টি ও হস্তমৈথুন হারাম কাজের অন্তর্ভুক্ত।"

সুন্নত বিয়ে : যদি বিয়ের চাহিদা না থাকে কিন্তু স্ত্রীর অধিকার আদায়ের সামর্থ্য রাখে তবে বিয়ে করা সুন্নত।

নিষিদ্ধ বিয়ে : যদি কারো আশংকা হয় সে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারবে না, চাই তা দৈহিক হোক বা আর্থিক তবে তার জন্য বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

মতভেদপূর্ণ বিয়ে : যদি চাহিদা ও প্রয়োজন থাকে কিন্তু সামর্থ না থাকে তাহলে তার বিয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। অধমের মতে ওয়াজিবের মতটিই অগ্রগণ্য। সামর্থ কষ্ট-শ্রম ও ঋণ করার দ্বারা অর্জন হয় যদি সে তা আদায় করার পরিপূর্ণ ইচ্ছা রাখে। আদায়ের চেষ্টাও করে। যদি সে আদায় করতে না পারে তবে আশা করা যায় আল্লাহ তার ঋণদাতাকে রাজি করিয়ে দেবেন। কেননা দীনের সংরক্ষণের জন্য ঋণ করেছিলো। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য ঋণ করা নাজায়েজ। বরং ভরণ-পোষণ ও মহর আদায় করার জন্য যদি তা নগদ প্রদান করতে হয় তাহলে ঋণ করতে পারবে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯-৪০]

বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে করণীয়

একব্যক্তি আমার কাছে এলো। যার বিয়ের প্রবল চাহিদা ছিলো। কিন্তু এতোটা গরিব ছিলো যে, বিয়ের সামর্থ ছিলো না। সে আমার কাছে নিজের অবস্থা খুলে

বলে চিকিৎসা চাইলো। আমি এখনো তার উত্তর দিইনি। আমার বলার আগে তার আলোচনা শুনে তিনি [উপস্থিত একজন] বললেন, 'রোজা রাখো। কেননা হাদিসে এসেছে–

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"যে বিয়ের সামর্থ রাখে না তার উচিত রোজা রাখা।"

লোকটি উত্তর দিলো, 'আমি রোজা রেখেছিলাম তবুও আমার দেহ-মনের চাহিদা কমেনি।' তার কথা শুনে তিনি আর উত্তর দিতে পারলেন না। আমি তাকে শুনিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কতোদিন রোজা রেখেছিলেন?'

সে বললো, 'দু'টি রোজা রেখেছিলাম।'

আমি বললাম, 'এজন্যই আপনি সফল হতে পারেননি। কেননা বেশি পরিমাণ রোজা রাখা প্রয়োজন ছিলো। একথা সরাসরি হাদিস থেকে প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ' এখানে عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ শব্দটি আবশ্যকের অর্থ প্রদান করে। আর لَازِمْ বা আবশ্যকীয় বিষয় দুই প্রকার। এক. বিশ্বাসগত, দুই. কর্মগত। বাক্যের ভাব-ভঙ্গি থেকে বুঝে আসে এখানে لُزُوْمِ اِعْتِقَادِىْ বা বিশ্বাসগত আবশ্যকীয় বিষয় উদ্দেশ্য নয়। কর্মগত আবশ্যকীয় কাজ উদ্দেশ্য। কারণ এই রোজা রাখা ফরজ নয়। বরং রোগের নিরাময়ের জন্য রাখতে বলা হয়েছে। আর যেকাজ কর্মগতভাবে আবশ্যক তা অধিক পরিমাণে বারবার করতে হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কাজ বারবার করে তখন বুঝতে হবে লোকটি সেই কাজটি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছে। ফলে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর উদ্দেশ্য–বারবার রোজা রাখো।'

বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, পশুশক্তি [যৌনচাহিদা] দুর্বল করার জন্য অল্পরোজা রাখা যথেষ্ট নয়। অধিক পরিমাণ রোজা রাখালেই সুফল পাওয়া যায়। এজন্য রমজান মাসের শুরুভাগে তা দুর্বল হয় না শেষভাগে কমে যায়। পরীক্ষা করে জানা গেছে, রমজানের শুরুতে পশুশক্তি [যৌনচাহিদা] দমিত হয় না বরং কোষ্ঠ-কাঠিন্য সৃষ্টি হওয়ার কারণে তা আরো বেড়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে তা কমে আসে। শেষ পর্যন্ত তা পুরোপুরি দুর্বল হয়ে যায়। তখন পশুশক্তি পরাজিত হয়। কারণ তখন অধিক রোজা রাখা হয়ে যায়।

প্রশ্নকারী চলে গেলো। কিন্তু মুজতাহিদ সাহেব [যারা সরাসরি শরিয়তের মূল উৎস কোরআন-হাদিস থেকে মাসয়ালা বের করার যোগ্যতা রাখেন, যিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।] কিছু বললেন না। পরবর্তীতে তার চিঠি এসেছিলো, 'আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। ওই দরিদ্রব্যক্তির মাধ্যমে তা হয়ে গেছে।
[আল ইফাজাতুল য়াওমিয়্যা: খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১৬৫ ও খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২২১]

ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়া কি বাবা-মায়ের দায়িত্ব? বিয়েতে বিলম্ব হলে কী পরিমাণ গোনাহ হবে

মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো তাগিদ আছে কী? বিলম্ব করলে কি কোনো গোনাহ হবে? যদি হয় তাহলে কী পরিমান গোনাহ হবে? কোরআন ও হাদিস থেকে পৃথক পৃথক উত্তর চাই।

উত্তর : বিয়ের তাগিদ দিয়ে কোরআন ও হাদিসে পৃথক পৃথকভাবে সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে ছেলে-মেয়ে উভয় অন্তর্ভুক্ত। মেয়েদের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ এসেছে, আল্লাহতায়ালা বলেন–

وَأَنْكِحُوا الأَيَامٰى مِنْكُمْ

"তোমরা অবিবাহিত নারী-পুরুষকে বিয়ে দিয়ে দাও।"

এটা আদেশসূচক শব্দ। যা উদ্দিষ্ট বিষয়টি ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ। الأَيَامٰى শব্দটি الأَيِّمُ-এর বহুবচন। হাদিসে যার ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে–

الأَيِّمُ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَيُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ إِنْ كَانَ كَذٰلِكَ

"এমন নারী যার স্বামী নেই; চাই সে কুমারী হোক বা বিবাহিত হোক এবং এমন পুরুষ যার স্ত্রী নেই।"

বাকি থাকলো হাদিস। মেশকাতশরিফের 'বাবুত তাজিলুস সালাত' বা তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ার অধ্যায়ে হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত–

১.

يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا

"রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, আলি! তিনটি কাজে বিলম্ব করবে না। নামাজ– যখন তার সময় হয়ে যায়। জানাজার নামাজ– যখন লাশ উপস্থিত হয়। উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের বিয়ে– যখন উপযুক্ত ঘর পাওয়া যায়।"
[তিরমিজি]

২.

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ

"হজরত ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যার কোনো সন্তান হলো [ছেলে বা মেয়ে] সে যেনো তার সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিয়ে দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তানকে যদি বিয়ে না দেয় এবং সে পাপে লিপ্ত হয় তাহলে পিতা গোনাহগার হবে।" [মেশকাত]

৩.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوْبٌ: مَنْ بَلَغَتْ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

"হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব ও আনাস ইবনে মালেক [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'তাওরাতে লেখা ছিলো– যার মেয়ে বারো বছরে উপনীত হলো অথচ সে মেয়েকে বিয়ে দিলো না তখন মেয়ে কোনো পাপে লিপ্ত হলে পিতাও গোনাহগার হবে।"

এসব বর্ণনা থেকে ওপর্যুক্ত আদেশ আবশ্যিক হওয়ার প্রমাণ। আর আবশ্যিক আদেশ পরিহার করলে জবাবদিহিতার [শাস্তির] মুখোমুখি হতে হয়। শেষ হাদিস থেকে গোনহ'র পরিমাণ জানা যায়। সন্তান যে প্রকার পাপেই লিপ্ত হবে পিতা সমপরিমান গোনাহ পাবে। চাই তা চোখের গোনাহ হোক, মুখের গোনাহ হোক বা অন্তরের গোনাহ হোক। [ইমদাদুল ফতোয়া: পৃষ্ঠা: ৫৩৪]

অধ্যায় ।২।

স্ত্রীর গুরুত্ব ও উপকারিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহতায়ালা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন পবিত্র সম্পর্ক দান করেছেন যে, মানুষ স্ত্রী থেকে বেশি প্রশান্তি অন্যকিছুতে পেতে পারে না। অসুস্থতার সময় সব প্রিয়জন নাক ধরে সরে পড়ে। বিশেষ করে বন্ধু অসুস্থ হলে অপর বন্ধু কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু এমনটি কখনো হবে না– স্ত্রী স্বামীকে ফেলে রেখে চলে যাবে। অসুস্থ্যার সময় স্ত্রীই সবচেয়ে বেশি সহমর্মিতা প্রদান করে। তবে যে স্ত্রী স্বামীকে রেখে চলে যায় সে মূলত স্ত্রীই নয়, স্ত্রীর যোগ্যতাই সে রাখে না।

[আততাবলিগ : চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৬]

স্ত্রীই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু

স্ত্রীর চেয়ে আপন কোনো বন্ধু হতে পারে না। বাস্তবতা হলো, দুঃখ-দুর্দশার সময় সব বন্ধু দূরে সরে যায়। কিন্তু স্ত্রী কখনো স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে না। অসুস্থতার সময় স্ত্রী যতোটা প্রশান্তি দেয় কোনো বন্ধুতো দূরের কথা প্রিয়আত্মীয়স্বজনও তা দিতে পারে না। সুতরাং পুরুষের জীবনে স্ত্রীর মতো পরমবন্ধু আর কেউ হতে পারে না। [হুকুকুল বাইত: পৃষ্ঠা: ২২]

নারীর সেবার মূল্যায়ন

নারীর সেবা আমার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, আমাকে ভাবিয়ে তুলে। তারা দাসীর মতো সেবা করে যায়। সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকে। যদি তারা নিজেদের মর্যাদা জেনে সেবা করতো তবে অনেক ওপরে উঠে যেতো। তাদের সেবা সম্পর্কে আমি বলে থাকি, তাদের প্রতি আমাদের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত, নয়তো পুরুষের সামর্থের বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে যাবে। হাদিসশরিফে এসেছে–

حُبِّبَ إِلَيَّ ثَلَاثٌ اَلنِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَالسِّوَاكُ

"রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'তিনটি জিনিস আমার কাছে প্রিয়। নারী, সুগন্ধী, মেসওয়াক।"

অর্থাৎ নারীর চলাফেরা, জীবনাচার ও সঙ্গ উপভোগ্য। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কেবল জৈবিকচাহিদার কারণে নারীকে পছন্দ করতেন না।

[মালহুজাতে জাদিদ মালফুজাত: পৃষ্ঠা: ২৮]

স্ত্রী অনুগ্রহশীল

প্রথমত নারী উত্তমব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। কারণ তারা নিরীহ ও দুর্বল প্রকৃতির। দ্বিতীয়ত তারা পুরুষের বন্ধু। আর বন্ধুত্বের কারণে মানুষের অধিকার বেড়ে যায়। এছাড়াও তারা পুরুষের ধর্মপ্রতিপালনে সহযোগী। নারীর মাধ্যমে পুরুষের দীনদারি রক্ষা পায় এবং পাপচিন্তা থেকে বিরত থাকে। এই বিবেচনায় তারা বড়ো অনুগ্রহশীল। ধর্মপরায়ণ মানুষ অনুগ্রহ ও অবদানের মূল্যায়ন করে। স্ত্রীর মূল্যায়ন ও সম্মান করা প্রয়োজন। কারণ, তারা ধর্ম ও জীবন তথা ইহকাল ও পরকালের সহযোগী। নারীর অধিকার রক্ষা করা আবশ্যক। কারণ, তাদের মধ্যে এমন অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার প্রত্যেকটি মূল্যবান ও মূল্যায়নযোগ্য। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪১ ও ১৪৯]

স্ত্রীর ত্যাগ

স্ত্রী যেমনই হোক, অবাধ্য হোক বা অবিবেচক হোক; সে স্বামীর জন্য পিতা-মাতাকে ছেড়ে এসেছে। পরিবারকে ত্যাগ করেছে। এখন তার দৃষ্টি কেবল স্বামীর ওপর। তার জীবনের সবকিছু এখন একমাত্র স্বামীর জন্য উৎসর্গিত। সুতরাং মানবতার দাবি হলো, এমন অনুগত ও ত্যাগী মানুষকে কষ্ট দেয়া যাবে না।

[আততাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৭]

স্ত্রীর সবচেয়ে বড়ো গুণ ও ত্যাগ হলো, সে স্বামীর জন্য সবধরনেরর বন্ধন ছিন্ন করে আসে। এজন্য যদি বাবা-মা বা অন্যকোনো আত্মীয়ের সঙ্গে স্বামীর মনোমালিন্য হয় তাহলে স্ত্রী সাধারণত স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করে। বাবা-মায়ের পক্ষ নেয় না। এতোটা ত্যাগের পরও অনেক পুরুষ তাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে। অনেকে তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করে যেনো তারা দাস-দাসীরও অধম। আবার অনেকে স্ত্রীর ভাত-কাপড়েরও খবর রাখে না। এগুলো খুবই গর্হিত এবং অমানবিক কাজ।

[মাজালিসে হাকিমুলউম্মত: পৃষ্ঠা: ১২ ও আত তাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪০]

নারীর অবদানসমূহ

নারী যদি ঘরে কোনো কাজ না-ও করে; কেবল ব্যবস্থাপনা ও দেখাশোনা করে তবুও তা মূল্যায়নযোগ্য। পৃথিবীতে অনেক ক্ষেত্রে শুধু ব্যবস্থাপনার জন্য মোটা অংকে লোক নিয়োগ করা হয়। ব্যবস্থাপকদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাহ্যিকদৃষ্টিতে কোনো কাজ করেন না। কারণ, তার অধীনে এতো বড়ো অফিসারগণ কাজ করেন যে, তার নিজের কোনো কাজে হাত দিতে হয় না। কিন্তু তাকে মোটা অঙ্কের বেতন ও সম্মান দেয়া হয় তার

সার্বিক দায়িত্বগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য। স্ত্রীর দায়িত্বও এতো বড়ো যে, ভাত-কাপড়ে তার বিনিময় দেয়া সম্ভব নয়। অনেক সম্ভ্রান্ত নারীকে দেখা যায়, তারা নিজহাতে ঘরের অনেক কাজ করে। বিশেষ করে অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্তান লালন-পালন করে। যা বেতনভুক্ত কোনো লোককে দিয়ে স্ত্রীর মতো করে করানো সম্ভব নয়। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৪৯]

একজন মৌলভি সাহেব বলতেন, স্ত্রীর জন্য খাবার তৈরি করা ওয়াজিব [আবশ্যক কর্তব্য]। আমার মতে, তাদের ওপর খাবার তৈরি করা ওয়াজিব নয়। আমি ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে নিচেযুক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করি।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

মোটকথা, নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর মনোরঞ্জন করা। আত্মিকপ্রশান্তি প্রদান করা। খাবার তৈরি করার জন্য নয়। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৫৫]

স্ত্রী ছাড়া ঘরের ব্যবস্থাপনা সুন্দর হয় না

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, স্ত্রী ছাড়া ঘরের ব্যবস্থাপনা সুন্দর হয় না। পুরুষের কাজ কেবল উপকরণ যুগিয়ে দেয়া আর নারীর কাজ তা বাস্তবে রূপ দেয়া। আমি অনেক ধনাঢ্যব্যক্তিকে দেখেছি তাদের অঢেল অর্থবিত্ত ছিলো কিন্তু স্ত্রী না থাকায় ঘরে কোনো শ্রী ছিলো না। লাখো বাবুর্চি রাখা হোক সেই প্রশান্তি কীভাবে পাওয়া যাবে স্ত্রীর মাধ্যমে যা অর্জন করা হয়? বাবুর্চি বেতনের চাকরি করে। একদিন তাকে কঠোর কথা বললে সে হাত ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। তখন বিপদ সামলাও! নিজের হাতে রুটি বানিয়ে চুলায় সেঁকো। নিজেই হাঁড়ি-পাতিল পরিষ্কার করো। স্ত্রী থাকলে এটা কি কখনো হতে পারে যে, স্বামী নিজে খাবার তৈরি করবে? অভিজ্ঞতার আলোকে এটাও দেখা গেছে যে, স্ত্রীর উপস্থিতিতে যদি চাকর দিয়ে কোনো কাজ করানো হয় এবং স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে যদি ওই কাজই করানো হয় তবে উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়। ঘরের মালিকের [মেয়েলোকের] কাজের লোকেরা বেশি চুরি করতে পারে না। তাদের অনুপস্থিতিতে ঘর শূন্য হয়ে যায়। যদি কোনো পুরুষ ঘরের কাজ জানেন তবু চাকর-বাকর তাকে সামান্য হলেও ধোঁকা দেয়। মহিলাদের মতো ব্যবস্থাপনা পুরুষ করতে না। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪৮]

শুধু ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে স্ত্রীরা পুরুষের যে পরিমাণ সেবা করে বিপুল পরিমাণ বেতনের বিনিময়ে কোনো চাকর-চাকরানি তা করবে না। কারো সন্দেহ থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পারে, স্ত্রী ছাড়া ঘরের ব্যবস্থাপনা কতোটুকু সুন্দর হয়। অনেক মানুষকে দেখা গেছে, তাদের পর্যাপ্ত বেতন ও আয় ছিলো কিন্তু স্ত্রী ছিলো না। খরচ ছিলো চাকরের হাতে। এতে তাদের সংসারের খরচ সীমাহীন বেড়ে যায়। বিয়ে করার পর খরচে ভারসাম্য আসে। পুরো ব্যবস্থাপনা ঠিক হয়ে যায়। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ১৪৯]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রাম্যবধূর মহত্ত্ব

গ্রাম্যমহিলারা সাধারণত বক্রস্বভাব, স্বল্পবুদ্ধি ও অসামাজিক হয়। কিন্তু তাদের মহত্ত্ব হলো, তারা চতুর ও প্রতারক হয় না। অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয়। [মালফুজাতে খায়রাতঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৫]

পবিত্র কোরআনে মহিলাদের প্রশংসায় বলা হয়েছে اَلْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ-এর দ্বারা বুঝে আসে, বাইরের জগত সম্পর্কে অজ্ঞ বা বিমুখ থাকা নারীর সহজাত প্রকৃতি। বরং আয়াতে عَنِ الْفَوَاحِشِ তথা অশ্লীলতা থেকে বিমুখতা উদ্দেশ্য, সাধারণ বিমুখতা উদ্দেশ্য নয়।

অশ্লীলতা থেকে বিমুখ থাকা পুরুষের কাছেও কাম্য। তারপরও তা নারীর প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরুষের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, বাইরের জগত সম্পর্কে সাধারণ বিমুখতাই নারীর জন্য অধিক উপযোগী। এখন নারীকে বলা হয়– পর্দা ছাড়ো, পর্দাহীন হও; জীবনের উন্নতি করো। আশ্চর্য একচিন্তা তাদের মাথায় ঢুকেছে।

[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১৪১]

নারী সবগুণ অর্জন করতে পারে কিন্তু লজ্জা না থাকলে সে নারী বলে গণ্য হবে না। বিয়ের উপকারিতা পেতে হলে বিয়ের কল্যাণকামিতার প্রতি নারীকে সবচেয়ে লক্ষ রাখতে হবে। যে নারী নির্লজ্জ হবে তার সবকিছু নিষ্ফল।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৭]

ভারতবর্ষের অধিকাংশ নারীই তাদের চারপাশের খোঁজখবর জানে না। ফলে তারা আল্লাহতায়ালার ঘোষিত মহত্ত্বের অধিকারী হবে। আল্লাহতায়ালা বলেন–

اَلْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

"তারা পুতঃপবিত্র, আত্মভোলা; ইমানদার।"

যখন মহানআল্লাহ নারীর সরলতা ও আত্মভোলা হওয়ার প্রশংসা করেছেন তখন বিশ্বাস করতে হবে আবশ্যই এতে কল্যাণ রয়েছে। সেই চতুরতা ও

সচেতনতার মধ্যে কল্যাণ নেই আজ যার প্রচলন হচ্ছে। বাস্তবতার দাবি এমনই। কোরআনে নারীর বাইরের জগত সম্পর্কে বিমুখ থাকা ও আত্মভোলা হওয়ার প্রশংসা করা হয়েছে। আর ভারতবর্ষের নারীর মাঝে তা অতুলনীয় মাত্রায় রয়েছে। [হুকুকুল বাইত: পৃষ্ঠা: ৪৪]

চরিত্রহীন ও কপট নারীর সৌন্দর্য

একলোক বললো, নারীরা অনেক সময় অসামাজিক হয়। তার চলাফেরায় অনেক সময় স্বামীর মন-মানসিকতা নষ্ট হয়। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, 'নারীর বদমেজাজি হওয়া একটি বিশেষ দিক বিবেচনায় অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যায়নযোগ্য গুণ। তা হলো, তাদের পবিত্র হওয়া। অধিকাংশ বদমেজাজি নারী চারিত্রিক পবিত্রতার অধিকারী। বিপরীত হলো অসতী নারী। তারা সারাক্ষণ সাজ-সজ্জা, রূপচর্চা, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

এমনিভাবে কিছু কিছু মহিলা বদমেজাজি হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরনের নারীদের পবিত্রতার ব্যাপারে আমার কোনো সংশয় নেই। অসতী মহিলারা মিষ্টভাষী হয়। তাদের বাহ্যিকআচরণও সুন্দর হয়। এরা ভয়ংকর। বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিড়ালের নখের মতো নিজের অনিষ্টতা লুকিয়ে রাখে। পুরুষকে বোকা ও বশ করে রাখে। এমন নারীর প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। বদমেজাজি ও মূর্খনারীর অসামাজিকতাও স্বভাবগতভাবে হয়ে থাকে। কারণ তাদেরকে বাঁকা হাড় থেকে বানানো হয়েছে। যদিও তার কথায় কোনো রস না থাকে, তার উঠা-বসায় কোনো শিষ্টাচার ও সৌন্দর্য না থাকে, সন্তানের লালন-পালন ও স্বামীর সেবা করতে না জানে তবুও তার পবিত্রতার গুণে সব ত্রুটি উপেক্ষা করা যায়। এমন নারীর প্রতি আমার আস্থা সীমাহীন। পবিত্র হওয়ার কারণে তারা বানোয়াট কথাবার্তা থেকে মুক্ত। এমন নারী বড়োই মূল্যবান সম্পদ। তারা সত্যিই মূল্যায়নযোগ্য। [নুসরাতুন্নেসা]

আমার অভিজ্ঞতা হলো, যেসব নারী সামাজিকতা ও ব্যবস্থাপনায় অদক্ষ হয় তাদের মধ্যে পবিত্রতার সম্পদ পুরোপুরি থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি এমন স্ত্রী পেয়ে থাকে তবে সতীত্ব ও পবিত্রতার কথা স্মরণ রাখবে। যাতে মনের কষ্ট দূর হয়ে যায়। এটাই কোরআনের শিক্ষা। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

عَسٰٓى اَنْ يَّجْعَلَ فِيْهِنَّ خَيْرًا كَثِيْرًا

"অসম্ভব নয় আল্লাহতায়ালা তাদের মাঝেই অনেক বরকত ও কল্যাণ দান করবেন।" [মাজালিসে হাকিমুলউম্মত]

বৃদ্ধস্ত্রীর মূল্য

বর্তমানে অনেক লোক বৃদ্ধস্ত্রীর প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। তাদেরকে ঘৃণা করে। অথচ তাকে স্বামীই বৃদ্ধা করেছে। মাওলানা ফজলুর রহমান বলেন, পুরনো স্ত্রী দাসী হয়ে যায়। প্রথমজীবনে যদিও আনন্দ বেশি হয় কিন্তু শেষজীবনে উপকার বৃদ্ধি পায়। অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়। সেবাপরায়ণ হয়। জ্ঞানীরা উপকারকে প্রাধান্য দেয়, আনন্দকে নয়।

আমি বলি, ভালোবাসার সময় যৌবনকাল। এ সময় উভয়ের মাঝে আবেগ থাকে। পরস্পর সহানুভূতির সময় হলো উভয়ের দুর্বলতা তথা বার্ধক্যকাল। দেখা যায়, বার্ধক্যে স্ত্রী ছাড়া অন্যকেউ উপকারে আসে না। মাজাহেরে উলুম মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ মাজহার সাহেবের স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে যান। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে মাওলানা সাহেবের সম্পর্ক এতো আন্তরিক ছিলো যে, স্ত্রী অসুস্থ হলেই তিনি মাদরাসা থেকে ছুটি নিয়ে চলে যেতেন। নিজহাতে স্ত্রীর সেবা করতেন। কখনোই স্ত্রীর সেবা-যত্ন চাকর-চাকরানির ওপর ছেড়ে দিতেন না।

[আততাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪২ ও হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৫৫ ও ৫৫০]

একটি ঘটনা

দুর্বলতা ও সহানুভূতি বিষয়ে একটি ঘটনা মনে পড়লো। একলোক ছিলেন। সরকারের ওপরমহলে তার বড়ো সম্মান ও মূল্যায়ন ছিলো। তার স্ত্রী মারা গেলো। কালেক্টর সাহেব শোক ও সান্ত্বনা জানাতে এসে বললেন, 'আপনার স্ত্রী মারা গেছে, আমরা বড়োই মর্মাহত।'

তখন তিনি ভাঙ্গাকণ্ঠে বললেন, 'কালেক্টর সাহেব সে আমার স্ত্রী ছিলো না। সে আমার সেবিকা ছিলো। গরম গরম রুটি খাওয়াতো, বাতাস করতো, ঠাণ্ডা পানি পান করাতো।' তিনি বলছিলেন আর কাঁদছিলেন।

[নুসরাতুন্নেসায়ে মালফুজ: পৃষ্ঠা: ৫৫২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের স্বামীভক্তি

আমি বলে থাকি, ভারতবর্ষের নারীগণ অপ্সরাতুল্য। বাহ্যিক শোভা-সৌন্দর্যে নয় বরং চারিত্রিক গুণাবলিতে ভারতবর্ষের নারীদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

[আততাবলিগ]

ভারতবর্ষের নারীরা বিশেষত আমাদের অঞ্চলের মেয়েরা প্রকৃতার্থে স্বর্গীয় অপ্সরা। যাদের সম্পর্কে আরবিতে عَاشِقَاتٌ لِأَزْوَاجٍ [যারা নিজস্বামীর ভক্ত] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তারা পুরুষের জন্য নিবেদিত। পুরুষের দেয়া সবধরনের কষ্ট মুখবুজে সহ্য করে, ধৈর্য ধরে। নয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে খোলা [আপোসের মাধ্যমে নারীর তালাক প্রার্থনা]-ও তালাক হয়ে থাকে।

আরবে তালাক ও খোলার পরিমাণ ব্যাপক। আমি একুশ বছরের এক নারীকে দেখেছি, তার স্বামী ছিলো সাতটি। সেখানকার পরিস্থিতি হলো, পুরুষের সঙ্গে নারীর বোঝা-পড়া না হলেই আদালতে মামলা দায়ের করে। বিচারক সাধারণত মেয়েদেরকে নিপীড়িত মনে করে। ফলে রায় তাদের পক্ষে যায়। বিচারক পুরুষকে খোলা বা তালাকে বাধ্য করে।

ভারতবর্ষের মেয়েরা সাধারণত প্রথমেই তালাক বা খোলার কল্পনাও করে না। ভয়াবহ পরিস্থিতিতেই কেবল খোলা বা বিচ্ছেদের দাবি করে। কানপুরের একটি ঘটনা। বিচারকের কথাতে স্বামী খোলা করতে সম্মত হয়। স্বামী যখন তাকে তালাক প্রদান করে তখন মহিলা চাপড় মেরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে এবং বলতে থাকে, 'হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো। আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম।' অথচ তার আবেদনের কারণেই তালাক প্রদান করা হয়েছিলো।

[হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ১১৫]

আমি অভিজ্ঞতার আলোকে কসম করে বলছি, ভারতীয় নারীর শিরায় শিরায় স্বামীপ্রেমের ধারা প্রবাহমান।

সতীত্ব ও পবিত্রতা

নারীজীবনে পবিত্রতা ও সতীত্ব একটি গুণ, অমূল্য গুণ। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

"আল্লাহতায়ালা হুরদের প্রশংসা করে বলেন, তাদের নিজদৃষ্টি স্বামীতেই সীমাবদ্ধ রাখবে। পরপুরুষের দিকে তাকাবে না।"

ভারতবর্ষের মেয়েরা এ বৈশিষ্ট্য ও গুণের বিচারে পৃথিবীর সমস্ত দেশের নারীদের থেকে স্বতন্ত্র। আমি দেখেছি, অনেক পুরুষ কুৎসিত চেহারার অধিকারী হয় কিন্তু তাদের স্ত্রীও স্বামী ছাড়া অন্যের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। বাস্তবে ভারতবর্ষের নারীরা হুরদের মতো স্বামীভক্তির অধিকারী, তাদের স্বামীরা যেমনি হোক না কেনো।

পর্দাশীল নারীরাতো অন্যের দিকে তাকায় না। যারা বাইরে বের হয় তারাও অনেক পুতঃপবিত্র। নিজের দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ রাখে। ঘোমটা পরে বের হয়। রাস্তায় কাউকে সালাম পর্যন্ত করে না। তারা পুরুষদেরকে লজ্জা করে। অন্যনারী এবং বৃদ্ধা মলিহাদেরকেও লজ্জা করে। যদি কোনো পুরুষ তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করে তবে বেশির ভাগই উত্তর প্রদান করে না অথবা ইঙ্গিতেই ক্ষ্যান্ত করে। যারা বাইরে যায় তাদের অবস্থা হলো, তারা স্বামী ছাড়া পরপুরুষের প্রতি জীবনে কখনো খেয়াল করে না। শতেকের কেউ যদি খারাপ হয় তবে তা গোনায় পড়ে না। যদি কোনো নারীর মাঝে এমন দোষ পাওয়া যায় তাহলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা হয়। আমি বলি হাজারে একটি পুরুষ পাওয়া যাবে যাকে দৃষ্টি বা খেয়াল [কল্পনা] হেফাজত করে অর্থাৎ পাপদৃষ্টি ও চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকে। আর হয়তো হাজারে এমন একটি নারী পাওয়া যাবে যার চরিত্র ভালো না।

[আততাবলিগঃ খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৫২ ও খণ্ডঃ ১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৩৯]

হিন্দুস্তানের নারীরা স্বামী ছাড়া অন্যকারো দিকে ঝুঁকে পড়ে না। অনেক নারীর সারা জীবনেও পরপুরুষের কল্পনাও আসে না। যদি তারা নিজের প্রতি কারো আকর্ষণ বুঝতে পারে তাহলে তার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মায়। এটাই এখানকার রীতি, সংস্কৃতি ও আদর্শ। কিন্তু ইউরোপের কোনো নারী যদি নিজের প্রতি কারো আকর্ষণ বুঝতে পারে তবে তার খুব খাতির ও আপ্যায়ন করে। ভারতবর্ষের নারীরা স্বামীর সঙ্গেই কেবল এমন সম্পর্ক রাখে। এটা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। সতী-সাধ্বী হওয়ার উদ্দেশ্যও এটা বরং তারা এক ধাপ এগিয়ে। ভারতে নিন্দার বিষয় হলো, পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ। আরবে নিন্দার বিষয় হলো, নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য পারস্যের। তা হলো, পুরুষের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ভারতীয় নারীগণ সাধারণ এতোটা নিরীহ ও অবলা হয়ে থাকে যে, তারা কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পর্যন্ত করে না। যদি কারো বাবা-মা জীবিতও থাকে তবু ভদ্রবংশের মেয়েরা কখনো স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করে না।

[আততাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪৯]
আরবের মেয়েরা আগে থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আরাম-বিলাসিতাতে কোনো কমতি দেখা দেয় তবে তারা আদালতে নালিশ করে। কিন্তু ভারতীয় নারীরা আদালতের নাম শুনলেই কাঁপতে থাকে। তারা মারা গেলেও আদালতে যাবে না। তারা আত্মীয়-স্বজন ও নিজেদের মাঝে হাজার কথা, হাজার অভিযোগ করবে কিন্তু কোর্ট-কাচারির নাম নিলে কানে হাত দেবে। আল্লাহ না করুন, কোনো বিচারকের কাছে যেনো আমাদের যেতে না হয়। আমি এটা বলি না যে, আমাদের দেশের কোনো নারীই আদালতে যায় না। হাজারে দুই-একজন এমন পাওয়া যাবে। তবে অধিকাংশ নারীই আদালতে যাওয়াকে ভয় করে। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৬]

বিনয় ও ত্যাগ

আরব ও হিন্দুস্তানের কিছু অঞ্চলে নারীরা তাৎক্ষণিক আদালতে নালিশ করে দেয়। হয়তো বিচারকের রায় অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেবে নয়তো জোরপূর্বক তালাক আদায় করে নেয়া হবে। কোনো কোনো দেশে অগ্রীম মোহর আদায় করতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মেয়েরা মোহরও ক্ষমা করে দেয় এবং জীবনভর ভরণ-পোষণের কষ্ট সহ্য করে। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪১]
আরবে মোহরের ব্যাপারে প্রচলন হলো, নারীরা পুরুষের বুকের ওপর বসে তা আদায় করে নেয়। কিন্তু ভারতে তা দোষণীয় মনে করা হয়। ভারতের মেয়েরা মোহরের কথা মুখেও আনে না বরং অধিকাংশ মৃত্যুর সময় স্বামীকে মাফ করে দেয়। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৫]

অগ্রাধিকার ও উৎসর্গের মানসিকতা

নারীর মধ্যে, বিশেষত ভারতীয় নারীর মধ্যে শুধু দোষ নয় বরং অনেক গুণও রয়েছে। নারীর আত্মোৎসর্গের পরিমাণ এতো যে তারা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করবে, গলাবাজি করবে, কান্নাকাটি করবে কিন্তু তার সীমা হলো যতোক্ষণ স্বামী শান্ত ও নীরব থাকে। যখন স্বামী একটু গরম হয়ে উঠেন তখন তাদের আর পানাহারেরও হুঁশ থাকে না। রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটায়। কখনো হাত থেকে পাখা নড়ে না। সেবার কোনো ক্রটি হয় না। কেউ দেখে বলতে পারবে না, এই মানুষই কিছু আগে ঝগড়া করেছে। অর্থাৎ তখন তারা নিজেদেরকে বিলীন করে দেয়।
এমনিভাবে মেয়েদের মধ্যে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার গুণ এতো বেশি যে, প্রতিদিন পুরুষরা খাওয়া শেষ করলে তারা খাবার খায়। ভালোখাবার পুরুষের

জন্য রেখে দেয়। খাবারের তলানী ও অবশিষ্ট খাবার তারা গ্রহণ করে। যদি অসময়ে কোনো মেহমান এসে পড়ে তবে স্বামীর কথা ও তার সম্মান রক্ষার চেষ্টা করে। ঘরে যা থাকে সঙ্গে সঙ্গে মেহমানের সামনে পরিবেশন করে নিজে অনাহারে থাকে। এটা এমন পবিত্র গুণ ও বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা অর্জন হয়। অধিকাংশ পুরুষের এই গুণ থাকে না। [আত-তাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৪]

ভারতবর্ষের নারীদের আনুগত্য

বাস্তবেই ভারতীয় নারীরা পৃথিবীর অন্যসব নারী থেকে ভিন্ন। তারা বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, অধিকাংশ সময় বাবা-মাকে ছেড়ে দেয়। এজন্য যদি কখনো বাবা-মা বা অন্যকোনো আত্মীয়র সঙ্গে মনোমালিন্য হয় তখন তারা স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করে। বাবা-মায়ের পক্ষ নেয় না। ভারতবর্ষের মেয়েরা মোহর মাফ করে দেয়। সারা জীবন থাকা-খাওয়ায় কষ্ট করে তবু কখনো কারো কাছে কোনো অভিযোগ করে না বরং নিজেরা কষ্ট করে উপার্জন করে স্বামীকে খাওয়ায়।
যদি কখনো স্বামী অবহেলা করে, কোনো রকমের মনোমালিন্যের কারণে বা বন্দি হয়ে ঘরছাড়া হয় এবং পঞ্চাশ বছর নিরুদ্দেশ থাকে, কোনো খবর না দেয় সে বেঁচে আছে না মরে গেছে এবং স্ত্রীর জীবনের কোনো উপায়-উপকরণ না থাকে এরপর স্বামী ফিরে আসে তবে স্ত্রীকে সে কোণাতেই বসে থাকতে দেখবে যে কোণাতে সে রেখে গিয়েছিলো। চোখ মেলে দেখবে কোনো স্বপ্ন ও আশা ছাড়াই সে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। সে তার শোকে পাগল হয়ে আছে। তার অবস্থা পুরুষের চেয়েও গুরুতর। এর অর্থ এই নয় যে, সে কোনো ধররেন খেয়ানত করেছে বা কারো প্রতি নজর দিয়েছে তথা লালায়িত হয়েছে। এটি এমন একটি গুণ যার বিনিময়ে পৃথিবীর সবপুরস্কার অর্জন করা যায়। এর বিনিময়ে সবদোষ-ক্রটি উপেক্ষা করা যায়। [আততাবলিগ কিসাউন নেসা: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৯]
কানপুরে দেখা গেছে, কোনো কোনো মহিলা স্বামীর অত্যাচার ও মারধরে অতিষ্ঠ হয়ে আদালতে তালাকের আবেদন করেছে। আদালতের মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায়। যারা জীবনের অত্যাচার ও মারধরের কারণে তালাক নিয়েছে বটে কিন্তু তালাকের সময় হাউমাউ করে কান্নাকাটি করে। যেনো তারা মারা যাচ্ছে। মাটি ভাগ হয়ে গেলে তারা ভেতরে আশ্রয় নেয়।
এটা খুবই সাধারণ কথা– মেয়ে স্বামীভক্ত হয়। ভারতের মেয়েদের স্বামীভক্তি এতো বেশি যে, তারা জ্বলেপুড়ে মরে। এরপরও কি তাদেরকে এতো কষ্ট দেয়া উচিত? অবিবেচকের মতো তাদেরকে পৃথক করে দেয়া যায়?
[আততাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১২]

অধ্যায় ।৩।

বিধবা নারীর আলোচনা

বিধবা নারীর বিয়ে

চরম মূর্খতার কারণে অধিকাংশ মানুষ বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিয়েকে দোষের মনে করে। কোথাও কোথাও এমন অভিশাপের কথাও জানা যায় যে, বাগদানের পর স্বামী মারা গেলেও মেয়েকে সারা জীবন অবিবাহিত রেখে দেয়। অনেক সময় বিয়ের পর মেয়েরা অল্পবয়সে বা যৌবনকালেই বিধবা হয়ে যায়। ব্যস! তার দ্বিতীয় বিয়েকে গোনাহ মনে করা হয়। অনেকে আবার ধর্মীয়জ্ঞান ও ওয়াজ-নসিহত শোনার কারণে দ্বিতীয় বিয়ে দোষের মনে করে না। কিন্তু মেয়ের প্রথম বিয়েকে যতোটা আবশ্যক মনে করে দ্বিতীয় বিয়েকে ততোটা গুরুত্ব দেয় না। বরং তার অর্ধেকও দেয় না। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩২]

বিধবা নারীর বিয়ে না করা জাহেলিযুগের রীতি

আরবে এ প্রথা ছিলো, যখন কোনো ব্যক্তি স্ত্রী রেখে মারা যেতো তখন সন্তান মাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে দিতো না নিজের কাছে রাখার জন্য। এই প্রথা ভারতেও আছে, বিধবাকে বিয়ে করতে দেয় না। এর প্রধান কারণ তাতে সম্পদ বণ্টন হয়ে যাবে।

ভাইয়েরা! এর সংস্কার আবশ্যক। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের প্রতি খেয়াল করুন এবং জাহেলিপ্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করুন।

[আজলুল জাহেলিয়্যাত ও হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৪৮]

কখন বিধবার ওপর বিয়ে ফরজ

কখনো বিধবার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে প্রথম বিয়ের মতো ফরজ। যেমন, বিধবা যুবতী হয় এবং তার বিভিন্ন আচরণে বিয়ের চাহিদাও প্রকাশ পায়, বিয়ে না দিলে ফেৎনার সম্ভাবনা আছে অথবা খাওয়া-পরার কষ্ট আছে, দারিদ্রের কারণে দীন-ধর্ম ও সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে– নিঃসন্দেহে এমন নারীর দ্বিতীয় বিয়ে করা ফরজ। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ১০৪]

কুমারীর চেয়ে বিধবার বিয়ে বেশি প্রয়োজন

যদি ঠিকভাবে চিন্তা করা হয় তবে প্রথম বিয়ের তুলনায় [যখন সে কুমারী ছিলো] দ্বিতীয় বিয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রথমে তার অভিজ্ঞতা ছিলো না। বিয়ের উপকার সম্পর্কের তার হয়তো কোনো ধারণাই ছিলো না বা শুধু পুঁথিগত

জ্ঞান ছিলো। আর এখন তার চাক্ষুসজ্ঞান তথা বিয়ের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। এই সময়ে শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণার সম্ভাবণা বেশি। যার কারণে কখনো স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, কখনো সম্ভ্রম নষ্ট হয়, কখনো ধর্ম আবার কখনো সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৩২]

কুমারী মেয়ের তুলনায় বিধবার প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক

মানুষের সাধারণ ধারণা, কুমারী মেয়ের দেখভাল বেশি প্রয়োজন। বিধবা মেয়ের প্রতি নজরদারির প্রয়োজন মনে করে না। এই ধারণা হিন্দুদের থেকে গৃহীত। এর কারণ, যদি কুমারী মেয়ের নামে কিছু ছড়িয়ে পড়ে তবে তাতে দুর্নাম হবে। কিন্তু বিবাহিত মেয়ের নামে কিছু ছড়ালে বদনাম হবে না কারণ তার স্বামী আছে। বিষয়টা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে। আসলে ধারণার ভিত্তি নিছক অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষ যখন ধর্মবিমুখ হয়ে যায় তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধিও লোপ পায়। আর যদি বিবেক-বুদ্ধির আলোকেও বিচার করা হয় তবুও দেখা যাবে, বিবাহিত মেয়ের প্রতি লক্ষ রাখা বা নজরদারি করা যতোটা আবশ্যক কুমারী মেয়ের প্রতি লক্ষ রাখা ততোটা আবশ্যক নয়। রহস্য হলো, খোদাপ্রদত্তভাবে কুমারী মেয়ের মধ্যে লজ্জা ও শালীনতার স্তর অত্যন্ত প্রখর হয়। তার মাঝে একটি প্রকৃতিগত প্রতিবন্ধকতা থাকে। বিবাহিত মেয়ের শালীনতার পর্দা খুলে যায়। তার মধ্যে প্রকৃতিগত পর্দা থাকে না। এজন্য তার পবিত্রতা ও নিরাপত্তার জন্য জোরালো নজরদারি প্রয়োজন। যেহেতু কুমারী মেয়ের দুর্নামের সম্ভাবনা বেশি আর বিবাহিত মেয়ের দুর্নামের সম্ভাবনা কম তাই কুমারী মেয়ের তুলনায় বিবাহিত নারীরা যৌনতার প্রতি বেশি আসক্ত। নিরাপত্তাব্যবস্থা কুমারী মেয়ের চেয়ে বেশি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ করে এর উল্টো। আজ তাদের কাছে নারীর পবিত্রতা ও নিরাপত্তার গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব কেবল নিজের সুনাম আর বদনামের। [আজলুল জাহেলিয়্যাতঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৬৮]

বিধবা নারীর বিয়ে না করার কুফল

অনেক জাতির মধ্যে এই অজ্ঞতা এখনো বিরাজ করছে, তাদের বিধবা মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া হয় না। অনেক সময় তারা দারিদ্রের কারণে খাবার-কাপড়ের প্রয়োজন হয়। সামাজিক মর্যাদার কারণে তারা অন্যের বাড়িতে কাজও করতে পারে না। আর যদি অন্যের বাড়িতে কাজ করে তবে অনেক সময় সে বাড়িতে থাকার প্রয়োজন হয়। যেহেতু তার কোনো আশ্রয় নেই

এজন্য দুশ্চরিত্রের লোকেরা তার ওপর চড়াও হয়। কখনো নিজের আগ্রহে, কখনো ভয়ে বা অন্যকোনো লাভের কথা চিন্তা করে বিশেষ করে তার মধ্যে যখন কাম-প্রবৃত্তি থেকে যায় সে নিজের দীন-ধর্ম ও সম্ভ্রম নষ্ট করে দেয়, বিকিয়ে দেয়। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩২]

বিধবা না চাইলেও তাকে বিয়ে দেয়া উচিত

অনেকে বলেন, আমরা তাকে [বিধবাকে] জিজ্ঞেস করেছিলাম সে রাজি হয়নি। এ ব্যাপারে আমার কিছু কথা আছে। আসলে যেভাবে জিজ্ঞেস করতে হয় সেভাবে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো? কথার কথা বলে দায়িত্ব শেষ করে দিলেন? জিজ্ঞেস করলে বিধবা অস্বীকার করবে যাতে স্বামীর পক্ষের আত্মীয়রা বলে সে তো অপেক্ষায় ছিলো, স্বামীকে ভয় করতো। দুর্নামের ভয়ে সে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। উচিত হলো, তাকে বারবার বিয়ের উপকার ভালো মতো বুঝানো। মনের দ্বিধা কাটানো। ভালোবাসা ও গুরুত্ব নিয়ে কথা বলা। তাকে বুঝানো– বিয়েতেই লাভ আর একা থাকলে ক্ষতি। যদি এরপরও রাজি না হয় তবে তা অপারগতা হবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৩২]

উপযুক্ত সন্তান থাকলে বিধবার দ্বিতীয় বিয়ে না করলে ক্ষতি নেই

যথাসম্ভব বিধবা নারীকে বিয়ে দেয়াই ভালো। কিন্তু যদি বিধবা সন্তানের মা হয়, পড়ন্ত বয়সের হয়, থাকা-পড়ার ব্যবস্থা থাকে, আবার বিয়ে করতে অমত হয়, আচার-আচরণে স্বামীর প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ না পায় তবে তাকে নিয়ে বিয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩২]

বিধবানারীর প্রতি শ্বশুরবাড়ির অবিচার

কোনো মুসলিমসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলন আছে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষের লোকেরা নিজেদের অধিকার মনে করে। অর্থাৎ মা-বাবা তার অভিভাবক নয়; দেবর-শ্বশুর তার অভিভাবক ও মালিক। সে নারী নিজে নিজের মালিক থাকে না। সে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করতে পারে না। বাবা-মা তাকে বিয়ে দিতে পারে না বরং স্বামীর বড়োভাই যেখানে বিয়ে দিতে চান সেখানে হবে। যেমন, শ্বশুর চাইলো তার ছোটোছেলের সঙ্গে বিয়ে হোক আর মা-বাবা চাইলো অন্যত্র বিয়ে দিতে। তখন বাবা-মায়ের কর্তৃত্ব চলবে না। সাধারণত তারা চায়– এই বউ ঘরের বাইরে না যাক।

কানপুরে একমেয়েকে জোরপূর্বক দেবরের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। মেয়েটি বাধ্য হয়। কারণ যদি শ্বশুরের কথা না শুনে তবে খাবার-কাপড় মিলবে না। আমার

কাছে একলোক এসে বলে, আমার ভাবী আমার হক বা অধিকার। সে অন্যত্র বিয়ে করতে চাচ্ছে। আপনি একটি তাবিজ দিন যাতে সে আমার সঙ্গে বিয়ে করতে রাজি হয়। অন্যএক মহিলা নিজের পুত্রবধূকে একবাচ্চাছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়। আফসোস! মহিলাদের বিবেকের উপরতো পর্দা আগে থেকেই ছিলো এখন পুরুষের বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। তারাও বিষয়টি লক্ষ করে না। তা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না।

নানুতা'য় একবিধবা মহিলার বিয়ে হয়। তার অসম্মতিতেই তাকে বিদায় করা হয়। বলা হয়, তাকে সেখানে নিয়ে রাজি করে নিয়ো। এখানে একমহিলার ইদ্দত [স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর মহিলা যে সময়টুকু নতুন বিয়ে থেকে বিরত থাকে] চলাকালীন বিয়ে হয়। আমি জিজ্ঞেস করলে বলে, বিয়ের নিয়তে নয় এমনি সম্পর্কটা জুড়ে দিলাম যাতে অন্যকারো সঙ্গে বিয়ে করতে না পারে। কিন্তু বেকুব এরপর আর বিয়ে করেনি।

মানুষ অভিযোগ করে বলে, ধ্বংস এসে গেছে, মহামারি এসে গেছে। মানুষ যখন এমন বৈধতার আবরণে অবৈধ কাজ করে তখন মহামারি না এসে যাবে কোথায়? [আজলুল জাহিলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৭৪]

অবিচারের ওপর অবিচার

নারীদের ওপর এতোটাই অবিচার হচ্ছে যে, মানুষ তাদের ওপর সবধরনের কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করে এবং তার প্রভাব এতোটাই বিস্তৃত যে, নারীরাও নিজেদেরকে তাদের মালিকানাধীন মনে করে। সে জানেও না তার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

সংকট ও সমস্যার সৃষ্টি

ধরা যাক, কোনো স্বামী মারা গেলো এবং সে কোনো সম্পদ রেখে গেলো না। শুধু স্ত্রী রেখে গেলো। শ্বশুর পুত্রবধূর জন্য কষ্টে পড়ে যায়। তবু স্ত্রী এখান থেকে যায় না। কারণ এটা তার বাড়ি। যেখানে পাল্কি চড়ে এসেছে সেখান থেকে খাটিয়ায় চড়ে বের হবে। যেহেতু সে এদের মালিকানাধীন মনে করে তাই নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক থাকে না। এখন সে শ্বশুরের ওপর নিজের অধিকার কামনা করে এবং যা তাদের ওপর কষ্টকর হয়ে যায়। খুব ভালো! এটাই তোমার শাস্তি। এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে, মালিকানাধীন বস্তুই মালিকের ওপর জুলুম করছে। [আজলুল জাহেলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৮৩]

শরিয়তবিরোধী মূর্খতাপূর্ণপ্রথা

মূর্খমানুষের একটি বোকামি হলো তারা পুত্রবধূকে নিজের মালিকানাধীন জিনিস মনে করে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মেয়েকে নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথাও বলতে দেয় না। নিজেদের অধিকার মনে করে। এটা প্রথম গোনাহ। মা-বাবার অধিকার হরণ করা– এটা দ্বিতীয় গোনাহ। তৃতীয়ত যুবতী তথা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের অধিকার আছে সে যেখানে খুশি বিয়ে করবে। তারা এই অধিকারও হরণ করে। এটা শরিয়তের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ। নারীর স্বাধীনতা হরণ। বাবা-মায়ের অধিকার লংঘন। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

আফসোস! তারা নিজেদের প্রশংসার দাবিদার মনে করে যে, তারা বিধবাকে বিয়ে দিয়েছে। অথচ তারা বিয়ের কোনো উপকার ও কল্যাণ অবশিষ্ট রাখেনি। আরবেও এমন অবিচার চলতো। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আগমন করে তা নির্মূল করেন। তিনি বলেন, "ছয়ধরনের মানুষের ওপর আমি, আল্লাহতায়ালা ও ফেরেশতাগণ অভিশাপ করেন।" তার মধ্যে একজন হলো যারা জাহেলিপ্রথা পুনরুজ্জীবিত করে। আর এখানে তোমরা তা শরিয়তের বিরোধিতার সঙ্গে করছো। আল্লাহর ওয়াস্তে এই কুফরিপ্রথা পরিহার করো। এই জাহেলিপ্রথা নির্মূলের চেষ্টা করো। [আজলুল জাহিলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৮৪]

জোরপূর্বক বিয়ে

অনেকে বলেন, আমরা তার [বিধবা] মুখে 'ইজন' বলিয়েছি। অর্থাৎ অনুমতি নিয়েছি। কিন্তু এই অনুমতিগ্রহণ কেবল গা বাঁচানোর জন্য। যাতে কেউ বলতে না পারে– জিজ্ঞেস না করেই বিয়ে দিয়েছে। শরিয়তের বিধান হলো, বিধবার বিয়ে মুখে না বললে বৈধ হয় না। প্রকৃত মনোবাসনা বা সন্তুষ্টির তোয়াক্কা সেখানে করা হয় না। কখনো জিজ্ঞেস না করেই বিয়ে দিয়ে দেয়। অনেকে মুখে স্বীকারোক্তি আদায় করে। তবুও এটা তার প্রতি অবিচার। কারণ এরা নিজেদেরকে মালিক মনে করে স্বীকারোক্তি আদায় করে। অপরদিকে তারা বাবা-মায়ের অধিকার স্বীকার করে না।

বিধবানারীর প্রতি শ্বশুরবাড়ির করণীয়

স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবানারীকে স্বামীর সম্পদের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে। এরপর ইদ্দতপালন শেষে তাকে বাবা-মায়ের কাছে অর্পণ করতে হবে। নিজের ঘরে রাখা যাবে না। কারণ যতোদিন স্বামীর বাড়ি থাকবে ততো মালিকানার ধারণা দূর হবে না। এজন্য আবশ্যক হলো তাকে প্রাপ্যসম্পদ বুঝিয়ে দিয়ে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেয়া। তারা তাকে বসিয়ে রাখুক বা বিয়ে দিক। [আজলুল জাহিলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৮৪]

কুফু বা সমতাবিধান

অধ্যায় ।৪।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুফুর গুরুত্ব ও অমান্যের কুফল

ইসলামিশরিয়ত কুফু বা বিয়েতে নারী-পুরুষের সমতাবিধানের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুণের বিবেচনা করেছে। উত্তম হলো, নিজের সমপর্যায়ের কোনো নারীকে বিয়ে করা। কারণ, অসম তথা অন্যস্তরের মানুষের চরিত্র ও অভ্যাস অধিকাংশ সময় ভিন্ন হয়। ফলে তাদের মাঝে সবসময় তিক্ততা লেগে থাকে। তাহলে একজন মুসলিমনারীকে সারাজীবন অবমূল্যায়ন করার কী প্রয়োজন? তাছাড়াও সামাজিকভাবে তাদের সন্তান বিয়ে দিতে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে সে দুর্দশায় কেনো জড়াবে?

যদি সন্তান অসম কোনো নারী থেকে হয় তাহলে পরিবারের লোকেরা তাদেরকে সমকক্ষ মনে করে না। তখন তাদের বিয়ে দিতে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ২৫-১১২]

তাছাড়া অসমপর্যায়ে বিয়ে করা আত্মমর্যাদাবোধ ও কল্যাণপরিপন্থী। সম্ভ্রান্ত মহিলাকে নিচুস্তরের মানুষের শয্যাসঙ্গী হতে হয়। এমন হলে অধিকাংশ সময় নারীরা নিজের স্বামীর মূল্যায়ন করতে পারে না। এতে বিয়ের সবকল্যাণ দূর হয়ে যায়। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ১১২।

কুফুর প্রয়োজনীয়তা ও তার মাপকাঠি

কুফুর ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়– লজ্জা দূর করা। অর্থাৎ মূলভিত্তি হলো লজ্জাস্কর হওয়া না হওয়া। আর লজ্জার ভিত্তি সামাজিক প্রচলন। [এমদাদুল ফতোয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৭১]

কুফুর ক্ষেত্রে পুরুষের দিক বিবেচনা করা হবে

বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার থেকে নিচু স্তরের হবে না। বরং মহিলা নিচু স্তরের হবে। অনেকে বলেন, নিচু স্তরের ছেলের কাছে মেয়ে দাও। কিন্তু নিচু স্তরের মেয়ে ঘরে এনো না। কেননা নিচু স্তরের মেয়েলোক ঘরে আনলে তার থেকে যে সন্তান হবে তার দ্বারা স্বামীর বংশের অধঃপতন হবে। আর নিচু স্তরের ঘরে মেয়ে যায় তাহলে সে বংশ উজ্জ্বল করবে। অথচ সম্পূর্ণ ভুল। শরিয়তের সঙ্গে ঠাট্টার শামিল। ইসলামিফিকাহ বা আইনে কুফুর বিধান হলো–

اَلْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ جَانِبِهِ اَيِ الرَّجُلِ لِاَنَّ الشَّرِيْفَةَ تَأْبٰى اَنْ يَكُوْنَ فِرَاشًا لِلدَّنِيِّ
وَلَاتُعْتَبَرُ مِنْ جَانِبِهَا لِاَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَفْرِشٌ فَلَاتُغِيْظُهُ۔

"সমতা পুরুষের ক্ষেত্রে বিবেচ্য। কেননা সম্ভ্রান্ত তথা বংশীয় নারী নিচুস্তরের পুরুষের শয্যাসঙ্গী হতে চায় না। নারীর ক্ষেত্রে সমতা বিবেচ্য নয় কেননা পুরুষ শয্যাধিকারী। সে শয্যা ব্যবহারে অপছন্দ করে না। এটা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য।" [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ১১২]

কুফু ছাড়া বিয়ে হওয়া না হওয়ার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

কুফু বা সমতাহীন বিয়ের কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। কিছু অবস্থায় বিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়। কিছু অবস্থায় সঠিক ও আবশ্যক হয়ে যায়। যা ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকে না। কিছু অবস্থায় বিয়ে হয়ে যায় তবে ভেঙ্গে দেয়ার সুযোগ থাকে।

প্রথম অবস্থা : প্রাপ্তবয়স্ক নারী যদি অভিভাবক ও আত্মীয়ের অনুমতি ছাড়া কুফু তথা সমতা ছাড়া কোথাও বিয়ে করে তাহলে ফতোয়া হলো তার বিয়ে ঠিক হবে না বরং বিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল বলে গণ্য হবে। বিয়ের পর যদি অভিভাবক ও আত্মীয় অনুমতি প্রদান করে তবুও বিয়ে ঠিক হবে না। কেননা বিয়ের অনুমতি আগে হওয়া আবশ্যক। এজন্য মেয়েদের উচিত এমন কাজ কখনো না করা। যদি করে তাহলে বিয়ে সঠিক না হওয়ার কারণে সবসময় বিপদে পতিত থাকবে। [দুররুল মুখতার]

দ্বিতীয় অবস্থা : পিতা বা দাদা যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে নিজেদের অদূরদর্শী চিন্তা-ভাবনা থেকে সমতাহীন কোনো জায়গায় বিয়ে দেয় এবং পিতা-দাদা মন্দপ্রকৃতিরলোক হিসেবে পরিচিত না হন। তাহলে এই বিয়ে আবশ্যক হয়ে যায়। তা ভেঙ্গে দেয়ার কোনো অধিকার থাকে না।

তৃতীয় অবস্থা : পিতা বা দাদা ছাড়া অন্যকোনো আত্মীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে অসম কোনো স্থানে বিয়ে দেয় অথবা দাদা অসমস্থানে বিয়ে দেয় কিন্তু সে মন্দলোক হিসেবে পরিচিত হয় বা মাতাল অবস্থায় বিয়ে দেয় তাহলে এই বিয়েও বাতিল বিবেচিত হবে।

চতুর্থ অবস্থা : প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যদি অভিভাবকের অনুমতিতে অসম কোনো স্থানে বিয়ে করে তাহলে বিয়ে সঠিক ও আবশ্যক হয়ে যায়। তা ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকে না। [আলহিলাতুল নাজেজা: পৃষ্ঠা: ১০৪-১০৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাত-কূলের পরিচয়

ইসলামিশরিয়তে কুফু বা সমতা বিধানের ক্ষেত্রে যেসব গুণের বিবেচনা করা হয় বংশ বা কূল তার অন্যতম। [এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৯]
বংশীয় সমতা সামাজিকভাবে নির্ধারিত হবে। মানুষের প্রকৃতিগত বা সত্ত্বাগত ভদ্রতা ও সম্মান তা ধর্মীয় মানদণ্ডে হোক বা জাগতিক মানদণ্ডে হোক তা-ও বংশের মতো বিবেচ্য বিষয়। যেমন ফিকাহবিদদের ভাষ্য دِيَانَةً وَمَالًا وَحِرْفَةً [ধর্ম, সম্পদ ও পেশাগত দিক থেকে] তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর ভিত্তিও সামাজিক রীতি। [এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৯]

জাতিগত বৈচিত্রের রহস্য

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো।"
যার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত আমাদের কাছের বা দূরের আত্মীয়। যাতে তাদের অধিকার আদায় করা হয়। এখানে আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি তৈরির রহস্য বর্ণনা করেছেন। তা হলো পরস্পর পরিচিত হওয়া। সে আনসারি আর তিনি সিদ্দিকি কিংবা ইনি ফারুকি বা থানভি– যদি এমন পার্থক্য না থাকতো তাহলে পৃথক করা কঠিন হয়ে যেতো। কেননা নাম পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এক নামে বহুমানুষ থাকে। কোনো ভিন্ন বাসস্থানের হয় যেমন, একজন দিল্লির অপরজন লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি। তবুও একশহরে একনামে বহুমানুষ থাকে। তখন মহল্লা হিসেবে পার্থক্য করা যায়। যদি একমহল্লায় একনামে একাধিক লোক থাকে তখন বংশ বা গোত্র হিসেবে পার্থক্য করতে হয় গোত্রের পার্থক্যের কারণে।
কিন্তু আজ মানুষ বংশীয় পরিচয়কে দাম্ভিকতার হাতিয়ার বানিয়েছেন। এখন দুই শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক বংশ ও বংশীয় মর্যাদার মূলোৎপাটন করে ফেলেছে। তাদের ধারণা, কোরআনশরিফে জাতি-বৈচিত্রের উদ্দেশ্য হিসেবে কেবল পরস্পর পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে লক্ষ করে তারা বংশের ভিত্তিতে মর্যাদার পার্থক্য বা বংশীয় মর্যাদা অস্বীকার

করেছে। বরং তাদের কাছে দেহলভি, লৌক্ষ্ণবি, হিন্দুস্তানি, বাঙালি সম্বোধন যেমন শুধু পরিচয়ের জন্য, এ দ্বারা কোনো মর্যাদালাভ করা যায় না। তেমনি কোরায়শি, সাইয়েদ, ফারুকি, উসমানি ইত্যাদি উপাধিও পরিচয়ের জন্য, এর দ্বারা কোনো মর্যাদালাভ করা যাবে না। তাদের প্রমাণ لِتَعَارَفُوْا অর্থাৎ বংশ শুধু পরিচয়ের জন্য। এখানে সম্মানের কিছু নেই।

কিন্তু এই আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের অন্যান্য আয়াত এবং হাদিসের প্রতি খেয়াল করতে হবে। [আততাবলিগ : খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ২১৭]

বংশীয় মর্যাদার মূলকথা

১. মহান আল্লাহতায়ালা বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

"এবং আমি নুহ ও ইব্রাহিমকে [নবি হিসেবে] প্রেরণ করেছি। নবুওয়ত ও কিতাব তার বংশের জন্য নির্ধারণ করেছি।"

এর দ্বারা বুঝা যায়, নুহ ও ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর পর নবুওয়ত তাদের বংশের জন্য সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর বংশের জন্য এই মর্যাদা অর্জিত হলো যে, ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত নবুওয়ত ও কিতাব তাঁর বংশের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

২. হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا

"মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মতো খনিতুল্য। তাদের মধ্যে যারা জাহেলিযুগে উত্তম ছিলেন তারা ইসলামের যুগেও উত্তম যখন তারা ইলম অর্জন করে।"

অনেকে ধারণা করেছেন, ওপর্যুক্ত আয়াতের মধ্যে যে শর্ত করা হয়েছে إِذَا فَقِهُوْا অর্থাৎ 'যখন জ্ঞান অর্জন করবে' তখন তা বংশীয় লোকদের প্রতি সম্মানহানীকর। অথচ এটা সম্মানহানীকর নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] জ্ঞানার্জন করার পর জাহেলিযুগের উত্তমব্যক্তিকে ইসলামের যুগে উত্তম বলেছেন। সুতরাং ফিকাহ তথা জ্ঞানার্জন করার পর আর সমতা রইলো না বরং বংশীয় জ্ঞানীব্যক্তি এবং বংশীয় নন এমন জ্ঞানীব্যক্তি সমান নয়। বরং বংশীয় জ্ঞানীব্যক্তি অধিক উত্তম। এখানে প্রাধান্য দেয়ার উপযুক্ত কারণ রয়েছে।

এটাও ঠিক যে, বংশীয় মূর্খব্যক্তি থেকে অবংশীয় আলেম বা জ্ঞানী উত্তম। এটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু হাদিস থেকে এটাও জানা যায়, বংশীয় মর্যাদা বলতে একটা জিনিস অবশ্যই আছে। জ্ঞান ও ফিকাহ যোগ হলে অবংশীয় লোক বংশীয় লোক থেকে উত্তম বলে গণ্য হবে।

৩. হাদিসশরিফে আরো বলা হয়েছে,

اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

"ইমাম বা নেতা কোরাইশ থেকে হবে।"

অবশ্যই কোনো কারণেই রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কোরাইশের জন্য নেতৃত্ব নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ জাতীয় নেতৃত্বের জন্য কোরাইশি হওয়া শর্ত করেছেন। আর অন্যান্য নেতৃত্বের জন্য বংশীয় মর্যাদাকে প্রাধান্যের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ঘোষণা থেকে জানা যায়, বংশীয় লোকদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি অধিক পরিমাণ বিদ্যমান। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ১১২]

নেতৃত্ব কোরাইশ থেকে হওয়া রাষ্ট্রীয় শৃখংলার জন্য কল্যাণকর। স্বভাবজাতভাবেই আল্লাহ কোরাইশকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যখন তারা নেতা ও সর্দার হবে তখন অন্যদের আনুগত্য করতে লজ্জাবোধ না হয়। অন্যদের আনুগত্য করতে তাদের লজ্জাবোধ হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মানুষ তার বংশীয় ঐতিহ্য গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ করে। সুতরাং কোরাইশগণ নেতা হলে ইসলাম দু'ভাবে সংরক্ষিত হবে। **এক.** ইসলাম তাদের ঘরের জিনিস। **দুই.** ধর্মীয় সম্পর্ক। এর থেকে বুঝা গেলো, বংশের মাঝে সামাজিক কল্যাণ ও দায়িত্ববোধ রয়েছে। সুতরাং তা নিষ্ফল নয়। যে পার্থক্য আল্লাহ করে দিয়েছেন তা কে মিটাবে?

[হুকুকুল জাওজাইন, ওয়াজে ইসলাহুন নেসা; পৃষ্ঠা: ১৯৩]

৪. হাদিসের অংশ বিশেষ; রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেছেন,

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ-

"আমি মিথ্যানবি নই। আমি বনু আব্দুলমোত্তালিবের বংশধর।"

হোনাইনের যুদ্ধে যখন হজরত সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] পিছু হটে গেলেন তখন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নিজের ঘোড়া সামনে বাড়ালেন এবং বললেন, 'আমি সত্যনবি। আমি আব্দুলমোত্তালিবের বংশধর। অর্থাৎ আমি উচ্চবংশীয় ও উত্তম পরিবারের সদস্য। আমি কখনো পিছু হটবো না। এখানে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নিজ বংশ নিয়ে গর্ব করলেন। শত্রুকে ভয় দেখালেন– আমাকে ছোটো মনে করো না। তিনি

উচ্চবংশের লোক, যাদের বীরত্বের কথা সবাই জানে। যদি বংশের কোনো মর্যাদা না থাকতো তবে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কেনো বললেন, আমি আব্দুলমোত্তালিবের বংশধর?

৫. অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "আল্লাহতায়ালা ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর বংশধরদের মাঝে ইসমাইল [আলায়হিস সালাম]-কে নির্বাচন করেছেন। ইসমাইল [আলায়হিস সালাম]-এর বংশধরদের মাঝে কেনানাকে নির্বাচন করেছেন। আর কেনানার বংশধর থেকে কোরাইশকে নির্বাচন করেছেন। কোরাইশ থেকে বনুহাশেমকে। বনুহাশেম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন।"

৬. হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِ الْفِرْقَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِ بَيْتٍ فَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا

"আল্লাহতায়ালা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে উত্তম সৃষ্টির অন্তর্গত করেছেন। এরপর তাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উত্তমলোকদের দল তথা আরবজাতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর আবরদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে রেখেছেন উত্তমগোষ্ঠি তথা কোরাইশে শামিল করেছেন। এরপর তাদেরকে বিভিন্ন বংশে বিভক্ত করেছেন এবং উত্তমবংশ বনুহাশেম থেকে বানিয়েছেন। সুতরাং আমি জাতি, গোষ্ঠি ও বংশের বিবেচনায় সবচেয়ে উত্তমব্যক্তি। [তিরমিজি]

ওপর্যুক্ত উদাহরণ থেকে প্রমাণ হয়, বংশীয় সম্পর্ক সম্মানের দাবিদার। যদিও সম্মান পাওয়া আবশ্যক নয়। কেননা সম্মানের ভিত্তি হলো খোদাভীতি। বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরুলোকেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানী।"

[আততাবলিগ ও ওয়াজুল আকরামিয়্যা: খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ২২২]

বংশীয় সম্মান আল্লাহর দয়া, তা নিয়ে অহংকার করা নাজায়েজ

বংশীয় মর্যাদা মানুষের ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় নয়। যা ইচ্ছা করলেই অর্জন করা যায়। সুতরাং তা নিয়ে অহংকর করা যাবে না। কিন্তু তা আল্লাহর বিশেষ দান হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মানবিক যুক্তিতে অহংকার-গর্ব

সেসব বিষয়ে হয়ে থাকে যা মানুষের ইচ্ছাধীন। যেমন, মানুষের জ্ঞান এবং ভালোকাজ। কিন্তু শরিয়তের আলোকে এসব বিষয়েও গর্ব করা উচিত নয়।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৭০]

বংশ নিয়ে গর্ব করা, অহংকার করা সর্বাবস্থায় হারাম। আজ অভিজাত শ্রেণী বংশ নিয়ে অহংকার করেন। আর অভিজাত নয় এমন শ্রেণীর মাঝে অহংকার অন্যভাবে– তারা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণীর সমকক্ষ মনে করে। তাদের সঙ্গে নিজেদের কোনো পার্থক্য স্বীকার করে না। এটাও বাড়াবাড়ি।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৯৩]

বংশ নিয়ে গর্ব করতে নেই। তার অর্থ এই নয় যে, বংশীয় মর্যাদা বলতে কিছু নেই। যেমন, মানুষের সুন্দর ও অসুন্দর হওয়া, অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হওয়া যদিও কোনো ইচ্ছাধীন বিষয় নয় এবং তা নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। তবুও কেউ কি বলবে, সুন্দর হওয়া আল্লাহর বিশেষ দান নয়। নিশ্চয় আল্লাহর অতি মূল্যবান দান। তেমনিভাবে বংশীয় মর্যাদা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয় না হওয়ায় তা নিয়ে গর্ব করা যায় না। কিন্তু তা আল্লাহর অনুগ্রহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২১৮]

বংশীয় সমতার ক্ষেত্রে বাবা বিবেচ্য, মা নয়

একটি বড়ো ভুল হলো, বংশের ক্ষেত্রে মাকেও বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ কারো মা অভিজাত না হলে তাকে অভিজাত বলা হয় না। তাকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে না। অথচ শরিয়ত কুফু বা সমতার ক্ষেত্রে বাবাকে গণ্য করে, মাকে নয়। এমনিভাবে বংশ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে মায়ের বিবেচনা করা হয় না। যেমন, কোনো ব্যক্তির মা শুধু বনুহাশেমের, তার জন্য জাকাত নেয়া বৈধ। সুতরাং কেবল কারো বাবা যদি অভিজাত বংশের হয় তাহলে সে ওইব্যক্তির সমকক্ষ বিবেচিত হবে যার বাবা-মা দুইজনই অভিজাত বংশের।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৮]

শরিয়তের প্রমাণ

আরববাসীরাও নারী তথা মায়ের কারণে বংশ-মর্যাদায় কোনো ত্রুটি ধরেন না। কারণ, আল্লাহতায়ালা মায়ের বংশ বিবেচনা করার মূলোৎপাটন এমনভাবে করেছেন যে, এ ব্যাপারে কারো প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। হজরত ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর দু'জন স্ত্রী ছিলো। একজন সারাহ; তিনি বংশীয় ছিলেন। অপরজন হাজেরা; তিনি ছিলেন দাসী। হজরত ইসমাইল [আলায়হিস সালাম] তাঁরই সন্তান। যিনি আরবজাতির পিতা। সমগ্র আরবের মূলে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন একজন দাসী।

ভারতবর্ষের যেসব জাতি-গোষ্ঠি নারীর ক্রুটির কারণে অন্যবংশের যে সমালোচনা করে তা সমালোচনার ধুম্রজাল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দোষের কিছু নয়। ইসলামিশরিয়তে বংশবিচারে মায়ের কোনো বিবেচনা নেই।

[আততাবলিগ ও ওয়াজুল আকরামিয়্যা: খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ২২৪]

সাইয়েদের মাপকাঠি : প্রকৃত সাইয়েদ কারা

সবার ব্যতিক্রম হলো, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর পবিত্র বংশধারা হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে প্রমাণিত হবে। তাঁর বংশে যারা জন্মগ্রহণ করবে তারা সাইয়েদ এবং বনুহাশেম থেকেও উত্তম। মূলকথা, বংশের ক্ষেত্রে মায়ের কোনো বিবেচনা নেই। কিন্তু হজরত ফাতেমার সন্তানদের ক্ষেত্রে মায়ের বিবেচনা করা হবে। কেননা সাইয়েদ বংশের মহত্বের মূলমন্ত্র হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]। অন্যান্যদের উপর সাইয়েদদের সম্মান তাঁর জন্য।

এখানে আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর অনেক বংশধরের ভুল প্রমাণিত হয়। তারা নিজেদেরকে সাইয়েদ বলেন অথচ সিয়াদাত [সাইয়েদ হওয়া]-এর ভিত্তি হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] নন বরং হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহু]। হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর যেসব সন্তান হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে হয়েছে তারা সাইয়েদ; অন্যান্য স্ত্রীগণ থেকে যারা হয়েছেন তারা সাইয়েদ নন। সুতরাং আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বংশধরদের সাইয়েদ দাবি করা ভুল বরং তারা হাশেমি। বনুহাশেমের মর্যাদা তারা লাভ করবেন।

অনেক উলুয়্যি [হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর এমন সন্তান যারা হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে নয়] নিজেদের নামে সাইয়েদ লিখেন। এটা নাজায়েজ। কেননা সাইয়েদ পরিভাষার সম্মান রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] থেকে হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তবে হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর অন্যান্য স্ত্রীর সন্তানগণ শায়েখ বিবেচিত হবেন। খোলাফায়ে রাশেদিন [রদিয়াল্লাহু আনহম]-এর সন্তানদের শায়েখ বলা হয়। [ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ১; পৃষ্ঠা: ১৩]

যদি কোনো ব্যক্তির বাবা সাইয়েদ না হন এবং মা সাইয়েদা হন তাহলে সে ব্যক্তি নামের শেষে সাইয়েদ লিখতে পারবে না। হ্যাঁ, মা সাইয়েদা হওয়ায় সে বিশেষ মর্যাদালাভ করবেন। যদি নেসাব (জাকাত ফরজ হওয়ার নির্ধারিত পরিমাণের সম্পদ) পরিমাণ সম্পদের মালিক না হন তাহলে তার জাকাতগ্রহণ করা বৈধ। মোটকথা, বংশের ক্ষেত্রে মায়ের বিবেচনা করা হবে। তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মানুষের স্বাধীনতা ও দাসত্বের নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে মায়ের প্রতিনিধিত্ব করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের বংশতালিকা এবং একটি পর্যালোচনা

আমার সন্দেহ হয়, উপমহাদেশে যারা নিজেদেরকে অভিজাত দাবি করেন তারা আসলে অভিজাত কী-না। আশ্চর্য ব্যাপার, এখানে যে পরিমাণ শায়েখ; কেউ নিজেকে সিদ্দিকি, কেউ ফারুকি, কেউ ওসমানি, উলুয়্যি আবার কেউ আনসারি দাবি করেন। তাহলে কি [নাউজুবিল্লাহ] এই চার-পাঁচজন সাহাবা [রদিয়াল্লাহু আনহুম] ছাড়া অন্যান্য সাহাবা [রদিয়াল্লাহু আনহুম] নির্বংশ ছিলেন? কেউ নিজেকে হজরত বেলাল ইবনে বারাহ [রদিয়াল্লাহু আনহু] কিংবা হজরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বংশধর দাবি করে না। সবাই ওই চার-পাঁচজনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। এজন্য সন্দেহ হয়, এরা সবাই কৃত্রিম বন্ধু। বিখ্যাত এবং খ্যাতিসম্পন্ন সাহাবাদের নিজেদের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে।

এই সন্দেহের কথা অধম [লেখক] বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানে বলেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ কয়েকজন সাহাবার সঙ্গে বংশপরম্পরা মিলিয়ে থাকেন। যেমন, চার খলিফা আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলি [রদিয়াল্লাহু আনহুম]; হজরত আব্বাস, হজরত আবুআইয়ুব আনসারি [রদিয়াল্লাহু আনহুম] প্রমুখ। ভাবনার বিষয় হলো, ভারতবর্ষ বিজয়ের জন্য কি বিশেষভাবে এই কয়েকজন সাহাবার সন্তানদের নির্বাচিত করা হয় না-কি অন্যদের বংশধারা থেমে গিয়েছিলো? আর এই দুটি সম্ভাবনাই দুঃসাধ্য। এখানেই সন্দেহ হয়, সম্ভবত তারা এসব সাহাবা [রদিয়াল্লাহু আনহুম]-এর সঙ্গে বংশধারা মিলিয়ে গর্ব করতে চায়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৯]

ভারতবর্ষের বংশতালিকা

নিঃসন্দেহে যাদের কাছে বংশতালিকা সংরক্ষিত নেই তাদের দাবি গাল-গল্প। আর যাদের কাছে বংশতালিকা সংরক্ষিত আছে তাদের ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। যেমন, আমরা থানাভবনের ফারুকি হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সন্দেহ আছে। কেননা বংশতালিকায় ইবরাহিম ইবনে আওহাম আছেন। যার ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ তাঁকে ফারুকি লিখেন, কেউ আজলি লিখেন, কেউ তামিমি লিখেন। কেউ সাইয়েদ জায়দি লিখেন।

[হুকুকুল জাওজাইন ও ইসলাহুন নিসা: পৃষ্ঠা: ১৯২]

এটাও হতে পারে, তারা যার উত্তরসূরি বলে দাবি করেন– তা সত্য। উত্তরসূরি না হওয়া কোনো যথাযথভাবে প্রমাণিত নয় বরং বিভিন্ন কারণে এমনটি সন্দেহ হয়।
[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৯।

অন্যায় বংশনামা

কিছু মানুষ সামাজিকভাবে অভিজাত নন। কিন্তু অন্যায়ভাবে তারা পারিভাষিক অভিজাতদের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। শুধু অনুমাননির্ভর হয়ে অভিজাতবংশের উপাধি ব্যবহার করে। হাদিসে এমন দাবিকারী ব্যক্তির ওপর অভিশাপ এসেছে। কেউ কেউ শুধু অনুমাননির্ভর হয়ে নিজেদেরকে অভিজাত প্রমাণ করতে চায়। যেমন, একটি গোষ্ঠি নিজেদেরকে আরব প্রমাণ করেছে। তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষ রাখাল ছিলো। যেহেতু তারা পশুপালন করে তাই তাদেরকে রাখাল বলা হয়েছে। এরপর সাধারণ মানুষ ভুল করে শব্দ পরিবর্তন করে ফেলেছে।

এমনিভাবে কিছু মানুষ নিজেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বংশধারায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। তারা আরব হতে চায়। কিন্তু এটা বৃথা প্রচেষ্টা। কারণ তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। বরং শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে থাকে। সবাই জানে এটা বানানো কথা।
[আত তাবলিগ: খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ২১৫]

ভারতবর্ষে বংশের সমতা যেভাবে হবে

ভারতবর্ষের বংশতালিকারও আশ্চর্য কাহিনী আছে। জানাও নেই মানুষ কোথায় তা পেয়েছে। কেউ নিজেকে আব্বাসি বলে, কেউ ফারুকি বলে, কেউ সিদ্দিকি বলে। এখন যতো বেশি অনুসন্ধান করা হয় ততো বেশি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। মূলকথা জানা যায় না।

এখন যদি এসব বংশতালিকা না মেনে নেয়া হয় তাহলে বংশের কুফু বা সমতা বিচার করা হবে কীভাবে? সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানের ওপর ভিত্তি করে সমতা বিচার করতে হবে। বংশের অতীত অবস্থান নিয়ে বিচার করা যাবে না। কোরআনকারিমে আমাদেরকে হজরত আদম [আলায়হিস সালাম]-এর বংশধর বলা হয়েছে। এখানে সন্দেহের অবকাশ নেই। নয়তো বংশতালিকার বিতর্কের প্রতি তাকালে সেখানেও সন্দেহ হতো। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ১৯]

ভারতবর্ষে বংশীয় সমতা গ্রহণযোগ্য কী না

প্রশ্ন : ভারতবর্ষের পাঠান, রাজপুত ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যবংশে বিয়ে করা লজ্জার মনে করে। যদি কেউ এমন করে ফেলে তাহলে তাকে

বংশচ্যুত করা হয়। ফিকাহ'র গ্রন্থাদিতে আছে, আরব ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে বংশীয় সমতাগ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অনারবিরা বংশতালিকা সংরক্ষণ করে না। এখন প্রশ্ন হলো, যেসব অনারবি গোষ্ঠি অন্যের তুলনায় নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব করে, অন্যদেরকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে না– প্রথা অনুযায়ী তাদের মধ্যে কুফুর মাসয়ালা প্রযোজ্য হবে কী-না?

উত্তর: ওপরের বর্ণনা অনুযায়ী যখন বিষয়টি লজ্জা ও লজ্জাহীনতার এবং ওপর্যুক্ত বংশের লোকেরা অন্যবংশে বিয়ে করাকে লজ্জার মনে করে। তাই তাদের মাঝে কুফু বা সমতাবিধান প্রযোজ্য হবে।
[এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩৭১]

এখনো বংশীয় সমতা বিবেচ্য

হাদিসের বর্ণনা এবং ফিকহিবিধানের আলোকে প্রমাণিত, অনারবি দেশসমূহেও বংশীয় সমতা বিবেচনা করা হবে না। তবে ফিকাহবিদগণ এটাও লিখেছেন, যদি সামাজিকভাবে বংশে বংশে পার্থক্য থাকে তবে সমতা বিবেচ্য হবে। নয়তো হবে না। বংশীয় সমতার মূলভিত্তি সামাজিকতা। হাদিসেও বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। [এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৮]

আনসারি ও কোরাইশি পরস্পর কুফু কী-না

আনসারিগণ কোরাইশি না হলেও কোরাইশের সমান। 'ফতোয়ায়ে আলমগিরি'তে বলা হয়েছে, সব আরব পরস্পর সমান। এই হিসেবে আনসারি ও কোরাইশিকে পরস্পর সমান মনে করা হয়। তাছাড়াও কুফু বা সমতাবিধান লজ্জারোধ করার জন্য। লজ্জার ভিত্তি সামাজিকতা ও পরিচিতি। বর্তমানে সমাজ ও পরিচিতিতে আনসার ও কোরাইশকে সমান করা হয়। আগে সমান করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে সময়ের পরিবর্তনে বিধানও পাল্টে গেছে।
[এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৭১]

সারকথা

কুফু সম্পর্কে একজন মৌলভি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, চিন্তা করলেই বুঝা যায়, বিয়েতে কুফু শর্ত কারণসংশ্লিষ্ট। কারণ হলো, সামাজিক সম্মান-অসম্মান। যেমন, শায়েখ তথা চার খলিফার সন্তানগণ– ফারুকি হোক, ওসমানি হোক বা সিদ্দিকি হোক; যদি চান পরস্পর বিয়ে করতে তাহলে করতে পারেন। কারণ, সমাজে মান-সম্মানের কোনো প্রশ্ন নেই। এখানে মা আরবীয় হওয়ার শর্ত করা যাবে না। সমাজপরিচিতিতে সবার মর্যাদা সমান।
[আল ইজাফাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২০০, পুরনো সংস্করণ]

অনারবি আলেম আরবনারীর উপযুক্ত নয়

অনেক আলেম অনারবি আলেমকে আরবনারীর কুফু বা উপযুক্ত বলেছেন। কিন্তু 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে, অনারবিপুরুষ আরবনারীর উপযুক্ত নয়। চাই সে আলেম হোক আর বাদশা হোক না কেনো। এটাই অধিক সঠিক।
[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১১]

একটি প্রচলিত ভুল

একটি ব্যাপক সংকীর্ণতা হলো, কিছু গ্রাম্যমানুষ সব বিদেশিকেই নিচ ও অসম্মানী মনে করে। তাদের কাছে মান-মর্যাদা কয়েকটি বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ। যার কোনো ভিত্তি নেই। এজন্য কোনো ব্যক্তি যদি বাইরে থেকে বিয়ে করে আনে তবে তারা সেই নারীকে কখনোই সমগোত্রীয় নারীদের সমান মনে করে না। তখন সমগোত্রীয়দের সঙ্গে তাদের সন্তানাদির বিয়ে দেয়া ঝামেলা হয়ে যায়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১০]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় বিবেচনায় সমতা

বিয়ের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে কুফু বা সমতা বিবেচনা করা হয় ধর্ম বা ধর্মপরায়ণতা তার অন্যতম। এখানেও বংশের মতো নারী-পুরুষের চেয়ে নিচুস্তরের হলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু পুরুষ নারীর চেয়ে নিচুস্তরের হলেই সমস্যা। পুরুষের ধর্মহীন হওয়া তিন প্রকার। **এক.** اِعْتِقَادِیٌّ اُصُوْلِیٌّ মৌলিক বিশ্বাসগত **দুই.** اِعْتِقَادِیٌّ فُرُوْعِیٌّ অমৌলিক বিশ্বাসগত এবং তিন. اِعْتِقَادِیٌّ عَمَلِیٌّ কর্মকারণ বিশ্বাসগত।

প্রথম প্রকার : নারী মুসলমান আর পুরুষ বিধর্মী; চাই সে পুরুষ ইহুদি, খ্রিস্টান বা মূর্তিপূজারী হোক– এমন বিয়ে অবৈধ।

দ্বিতীয় প্রকার : নারী সুন্নি [সুন্নতের অনুসারী] আর পুরুষ বেদাতি হলে বিয়ের বিধান হলো, পুরুষের বেদাত যদি শিরক-এর পর্যায়ে হয়–যেমন বর্তমান সময়ের কাদিয়ানিসম্প্রদায় [যারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবি বিশ্বাস করে] প্রথম প্রকারের মতো তাদের বিয়েও অবৈধ।

আর যদি পুরুষের বেদাত শিরকের পর্যায়ে না হয় তাহলে সে মুসলমান বটে তবে সে সুন্নি মতে কুফু বা উপযুক্ত নয়।

বিতর্কিত অবস্থা

একটি অবস্থা হলো, কিছু বেদাতির কাফের হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়েকেরামের মতভিন্নতা আছে। যেমন, বর্তমান সময়ের কবরপূজারী সম্প্রদায়। যারা তাদেরকে কাফের বলেন তাদের কাছে সুন্নিনারীর বিয়ে অবৈধ। যারা কাফের বলেন না তাদের কাছে বিয়ে বৈধ তবে এখানে কুফু তথা উপযুক্ততা নেই। অধমের মতে [হজরত হাকিমুলউম্মত] এমন বিতর্কিত অবস্থায় এই ফতোয়া দেয়া উচিত যতোক্ষণ বিয়ে না হয় ততোক্ষণ বিয়ে বাতিল হওয়ার ওপর আমল করা আবশ্যক। কেননা সতর্কতা হলো একজন ভালোআকিদা বা বিশ্বাসের অধিকারী নারী একজন মন্দআকিদার মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না এবং এমন মন্দআকিদা যা কিছু মানুষের কাছে কুফরির শামিল।

আর যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন বিয়ে বৈধ হওয়ার মতো গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা বিয়ে হওয়ার পর তার বৈধতার মতগ্রহণ করাই সতর্কতা। কারণ, এখন

যদি বিয়ে অবৈধ হওয়ার মতগ্রহণ করা হয় এবং তাকে অন্যত্র বিয়ে দেয়া হয় তখন এ সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে যে, প্রথম বিয়ে ঠিক ছিলো। তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে অবৈধ হয়ে যাবে। তারা সর্বক্ষণ ব্যভিচারের মধ্যে থাকবে। একজন ধর্মপরায়ণ নারীর সারাজীবন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা আবশ্যক হবে। আর বিয়ে বৈধ হওয়ার মতগ্রহণ করলে এই সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না।

তৃতীয় প্রকার : ফাসেক তথা পাপীপুরুষ পুণ্যবান মহিলার উপযুক্ত নয়। কেউ কেউ বলেন, পুণ্যবান মানুষের মেয়ের বিধান পুণ্যবতী নারীর মতো। যেমন, পুণ্যবান নারী পাপীপুরুষের উপযুক্ত নয়। তবে কোনো ফিকাহশাস্ত্রবিদের কাছে প্রকাশ্য পাপাচারী হওয়া শর্ত। কুফু বা উপযুক্ততা ছাড়া বিয়ে হওয়া বা না হওয়ার বিধান ওপরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১৩-১১৪]

পুরুষ মুসলিম কী-না যাচাই করা আবশ্যক

সতর্কতার বিষয় হলো, আজকাল আধুনিকশিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষ নাস্তিকের আনুগত্য ও প্রবৃত্তিপূজায় এতোটা স্বাধীন ও নির্ভয় হয়ে গেছে যে, তারা নিঃসঙ্কোচে ধর্মের অকাট্যবিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে। অনেকে রিসালাত নিয়ে মন্তব্য করে। কেউ নামাজ-রোজা নিয়ে কথা বলে। কারো কারো তো কেয়ামতের ব্যাপারেই সন্দেহ আছে। এই জাতীয় মানুষগুলো কাফের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করলেও।

কোনো মুসলিমমেয়ের বিয়ে এমন কাফের পুরুষের সঙ্গে বৈধ নয়। কেউ যদি মুসলিম হওয়ার পর এমন কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সে কাফের হয়ে যায় এবং বিয়ে ভেঙ্গে যায়। সারা জীবন হারামে লিপ্ত থাকে। এজন্য আবশ্যক হলো, বিয়ের আগে স্বামীর যদি দাড়ি এবং ধর্মীয় পোশাক না থাকে তাহলে সে মুসলমান কী-না তা যাচাই করে নেয়া। বিয়ের পর যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে তওবা করিয়ে নতুন বিয়ের ব্যবস্থা করা।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৯]

যাচাই করা উচিত– ছেলে ভ্রান্তদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত কী-না

বিয়ের আগে কঠোর সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা আবশ্যক যে, ছেলে কোনো ভ্রান্দলের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয় তো? পুরনো কোনো ভ্রান্তদলের অনুসারী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ নেই। বর্তমানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হচ্ছে। আর সময়টি হচ্ছে মুক্তচিন্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার। তাই ছেলে কোনো নতুন সম্প্রদায়ের অনুগামী কী-না তা বিশেষভাবে যাচাই করা আবশ্যক।

ছেলে যদি ইংরেজিশিক্ষিত হয় তাহলে দেখতে হবে আধুনিকশিক্ষার প্রভাব, স্বাধীন মনোভাব, তার ধর্মকে ছোটো করে দেখা কিংবা ধর্মের প্রয়োজনীয় বিধান অস্বীকার করার স্তরে নিয়ে গেছে কী-না। নয়তো একটি কুফরিবাক্যও যদি মুখ থেকে বের হয়ে থাকে তাহলে নতুন করে ইসলামগ্রহণ এবং বিয়ে নবায়ন না করা মানে প্রতিনিয়ত হারামে লিপ্ত হওয়া। যা মানুষের আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী এবং ইসলামিশরিয়তে অগ্রাহ্যীয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১]

ইহুদি বা খ্রিস্টাননারী বিয়ে করা

কিছু কিছু মানুষ ইউরোপ থেকে এমন নারীদের বিয়ে করে আনে যারা শুধু জাতিগতভাবে খ্রিস্টান। ধর্মের বিবেচনায় তারা ধর্মহীন। কার্যত তারা কোনো ধর্ম মানে না। এমন নারীকে বিয়ে করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। আবার কিছুসংখ্যক মানুষ খ্রিস্টধর্মের অনুসারী নারীকে বিয়ে করে কিন্তু তার দ্বারা এতো প্রভাবিত হয়ে যায় যে, একসময় সে নিজের ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাও আবশ্যক।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১৪]

ছেলের ধর্মীয় অবস্থান জানতে হবে

বর্তমান সময়ে আবশ্যক হলো, পুরুষ মুসলিম না কাফের তা জানা। আগে দেখা হতো ছেলে পুণ্যবান না পাপী। কারণ, মুসলিমনারী এবং কাফের পুরুষের মধ্যে বিয়ে বৈধ নয়। আক্ষেপ! বর্তমানে যেসব ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া হয় আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তাদের কেউ কেউ এতোটা মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন মানসিকতার অধিকারী যে তাঁদের সঙ্গে ইমানের কোনো সম্পর্ক নেই। নামে মাত্র মুসলমান। নিঃসঙ্কোচে কুফরিবাক্য উচ্চারণ করে। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আবার এমন পুরুষের সঙ্গে একজন মুসলিমমেয়ের বিয়ে দেয়া হয়। পরিবারের সবাই আনন্দিত হয় এই ভেবে যে, একটি সুন্নত পালন করা হলো। যে সুন্নতের পূর্বশর্ত ইমান। জানা নেই নতুন বর কতোবার তা থেকে বের হয়ে গেছে।

একজন পুণ্যবতী মেয়ের সঙ্গে এমন একজন ইংরেজিশিক্ষিত ছেলের বিয়ে হয় যে এক বৈঠকে বলছিলো, বাস্তবে মোহাম্মদ অনেক চাপা মারতো। তার সঙ্গে আমার অনেক ভালো সম্পর্ক। কিন্তু রেসালাত একটি ধর্মীয় খেয়াল বা ধারণামাত্র। নাউজুবিল্লাহ!

এটা কুফরিবাক্য। এমন বললে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এ কথা যদি ছেলেপক্ষকে বলা হয় তাহলে তারা উল্টো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। বলবে, আমাদের বংশের নাককাটা হচ্ছে।

[দাওয়াতে আবদিয়্যাত, মোনাজায়াতে হাওয়া, হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৮৫]

বংশীয় আভিজাত্য বা সম্পদ দেখে অধার্মিকের সঙ্গে বিয়ে দেয়া

কিছু মানুষ সম্পদ ও খ্যাতির মোহে বা কোনো বংশীয় কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মেয়েকে একজন মন্দআকিদা বা বিশ্বাস এবং খারাপ মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। কখনো তার ধর্মবিশ্বাস কুফরি পর্যন্ত পৌঁছায়। বাহ্যিক দুর্দশা ছাড়াও তারা সারাজীবন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। সন্তান হলে হবে হারামি। আর যদি বিশ্বাস কুফরি পর্যন্ত না পৌঁছে তবুও সারাক্ষণ আত্মিকশাস্তির মধ্যে থাকে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১৪]

ধার্মিকতার ওপর আত্মীয়তা করার কারণ

যেসব কল্যাণের জন্য বিয়ের উদ্ভব হয়েছে এবং তা বৈধতা পেয়েছে তার সব কিছুই পরস্পর বুঝাপড়া, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার ওপর নির্ভরশীল। এটা নিশ্চিত, এমন ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব দীন তথা ধর্মের মধ্যে যতোটা পাওয়া যায় অন্যকোনো কিছুর মধ্যে ততোটা পাওয়া যায় না। কেননা ধর্মীয় বন্ধন ছাড়া অন্যসব বন্ধন ও সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। এমনকি কেয়ামতের দিন যা সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার সময় তখন ধর্মীয় বন্ধন থেকে যাবে।

فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

"তাদের মধ্যে আত্মীয়তার যে বন্ধন ছিলো তা সেদিন থাকবে না।"

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

"তাদের সবসম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।"

مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

"জাগতিক জীবনে তাদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। এরপর কেয়ামতের দিন একে অপরকে অস্বীকার করবে। একজন অপরজনকে অভিশাপ করবে।"
কিন্তু ধর্মীয়সম্পর্ক টিকে থাকবে। সে সময় তা শেষ হবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন—

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"দুনিয়ার সববন্ধু আজ পরস্পরের শত্রু কিন্তু খোদাভীরুগণ ছাড়া।"
[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮]

কারণ হলো, ধর্মপালন করায় মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। ফলে সে এমন ছোটো ছোটো বিষয় খেয়াল রাখে যা সাধারণত খেয়াল করা হয় না। ফলে তার দ্বারা কোনো অধিকার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সে কি কাউকে কষ্ট দেবে? সে কি নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারে? কারো ক্ষতি চাইতে

পারে? কারো সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে? তার চেয়ে সভ্য আর কে হতে পারে? [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮]

ধার্মিক মানুষের জন্য অধার্মিক মেয়ে বিয়ে করা ঠিক নয়

কিছু মানুষ বাজারি মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে। বিয়ে বৈধ এবং বিনা কারণে এমন সন্দেহও করা যাবে না যে, সে মহিলা এখনো লম্পট রয়ে গেছে। কিন্তু এই ব্যাপারেও সন্দেহ নেই, ধার্মিক মানুষের জন্য ধর্মবিমুখ মানুষের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ইসলামিশরিয়ত এমন সম্পর্ককে অনুচিত আখ্যা দিয়ে বিধান প্রণয়ন করেছে।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

"ব্যভিচারীপুরুষ বিয়ে করবে না ব্যভিচারী বা পৌত্তলিকনারী ছাড়া। ব্যভিচারী নারী বিয়ে করবে না ব্যভিচারী বা পৌত্তলিকপুরুষ ছাড়া।"
যদিও আয়াত ও অন্যান্য দলিলসমূহের ব্যাপকতা থেকে এই হারাম নিষিদ্ধ পর্যায়ে নয় যে, বিয়ে বৈধ হবে না বরং নিষিদ্ধের পর্যায়ে অর্থাৎ বিয়ে হয়ে যাবে তবে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। কিন্তু অপছন্দের ভিত্তি যদি মহিলা নিশ্চিত ব্যভিচারিণী হয় তাহলে বিয়ে করা হবে তীব্রমাত্রার অপছন্দনীয় অর্থাৎ হারাম। আর যখন সন্দেহ থাকে তাহলে অপছন্দের মাত্রা তীব্র হবে না।
হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে—

تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَلَا تَضَعُوْهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ

"তোমরা নিজেদের বীর্য তথা বংশবিস্তারের জন্য উত্তমনারী নির্বাচন করো। তা উপযুক্ত পাত্র ছাড়া রেখো না।"
এই হাদিস আগের বক্তব্যের সমর্থনে ব্যক্ত। আল্লাহ কোনো নবির জন্য এমন কোনো নারী নির্বাচন করেননি যারা কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। যদিও তারা পরে তওবা করুক না কেনো। وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ সৎচরিত্রের নারীরা সৎচরিত্রের পুরুষের জন্য— এই ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে। তবে যদি সে একনিষ্ঠ মনে তওবা করে এবং তাকে কেউ গ্রহণ না করে তবে তার ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য অথবা তার প্রতি যদি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তাহলে ভিন্নকথা। তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বাণী—

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

"প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য বিয়ের মতো উপকারী আর কিছু দেখা যায় না।"
[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৫১]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বয়সের সমতা

বর্তমানে মানুষ মেয়েদের অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত অবহেলা করে। যেমন, বাচ্চামেয়ের বিয়ে বয়স্কপুরুষের সঙ্গে দেয়া। যার পরিণতি হলো, স্বামী যদি মারা যায় তাহলে মেয়ের চরিত্র নষ্ট হয়। আবার কোথাও এই অবিচার হয়, ছোটো ছেলের সঙ্গে যুবতী মেয়ের বিয়ে দেয়। এখানে একটি বিয়ে হয়েছে বর ছোটো আর কনে বয়স্ক। দু'জনের বয়সের পার্থক্য এমন যে, যদি মহিলার প্রথম সন্তান ছেলে হতো তাহলে বর তার সমবয়সী হতো। আমি এমনটা অপছন্দ করি। এই অপছন্দ ওয়াজিব বা হারামের পর্যায় নয় বরং অপছন্দ স্বভাবসুলভ এবং বিবেকের। বয়সের সমতা হলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়।

[দাওয়াতে আবদিয়্যাত আজলুল জাহিলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৫৬]

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সমতা শরিয়তের বিধান

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সমতা রক্ষা করা আবশ্যক। বয়স স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আচরণগত [স্বভাব ও দৈহিক] বিষয়। একপ্রকার শরয়ি বিষয়ও বটে। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধানও লক্ষণীয়। কোরআনশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابًا

"জান্নাতে হুরগণ [জান্নাতের রমণী] সমবয়সী হবে।"

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا

"আমি বেহেশতিনারীকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছি। এরপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা।"

বয়সের ব্যবধানে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আমি লক্ষ করেছি, বাচ্চাদের সঙ্গে বাচ্চাদের যেমন আন্তরিকতা হয় বড়োদের সঙ্গে তেমন হয় না।

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ের প্রস্তাব সর্বপ্রথম হজরত আবুবকর [রদিয়াল্লাহু আনহু] দেন। এরপর হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] প্রস্তাব দেন। কারণ, এটুকু যোগ্যতা ও সম্মান তাঁদের অর্জিত ছিলো। তাঁদের

কন্যাদ্বয় রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সম্মানিতা স্ত্রী ছিলেন। এখন তারা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জামাতা হওয়ার সম্মান অর্জন করবেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ "সে অনেক ছোটো।" তাঁদের বয়স অনেক বেশি ছিলো। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বয়সের কথা বিবেচনা করে তাঁদের আবেদন নাকচ করে দেন।

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ের ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, হজরত আবুবকর ও ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা]--এর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর আপত্তি ছিলো– সে ছোটো, বাচ্চা। এর থেকে বুঝা গেলো, মেয়ের বয়স কম হলে স্বামীর বয়স বেশি হওয়া উচিত নয়। বয়সের অসমতায় বিয়ে দেয়াও ঠিক নয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যাত আজলুল জাহিলিয়্যাত]

বর-কনের বয়সের পার্থক্য কতোটা হওয়া উচিত

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ের সময় বয়স ছিলো সাড়ে পনেরো বছর। হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বয়স ছিলো একুশ বছর। এর থেকে জানা যায়, বর-কনের বয়সের সমতা ঠিক রাখা উচিত। উত্তম হলো, সমবয়সী স্বামী সমবয়সী স্ত্রী থেকে একটু বড়ো হবে। জ্ঞানীগণ বলেন, মেয়ে যদি একটু ছোটো হয় তাহলে সমস্যা নেই। রহস্য হলো, নারী অধীনস্থ হয় এবং পুরুষ কর্তৃত্বকারী। তাছাড়াও নারীর শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্য থাকে দুর্বল। ফলে সে আগে বৃদ্ধা হয়ে যায়। যদি দু'-চার বছরের পার্থক্য থাকে তাহলে সমতা আসে। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৭০]

অসম বিয়ে কনের অস্বীকার করা উচিত

ইমাম আবুহানিফা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর আত্মার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তার কারো কর্তৃত্ব থাকার মাসয়ালাটি মতবিরোধপূর্ণ। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইমাম আবুহানিফা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর ফতোয়া অধিক কল্যাণকর। বর্তমানে বাবা-মা বিয়ে ঠিক করলে কনের অস্বীকার করাকে লজ্জার মনে করা হয়। অথচ বিয়ে করতে বলা লজ্জার, অস্বীকার করা নয়। মূলত লজ্জা হলো, বিয়ে শব্দই তারা পছন্দ করে না। এটাই কি যুক্তির কথা নয়? সুতরাং বিয়ে অসমবয়সীর সঙ্গে হলে অবশ্যই অস্বীকার করবে।

[আজলুল জাহিলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৭০]

অল্পবয়সী মেয়ের বয়স্কপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করার ক্ষতি

যদি মেয়ে অল্পবয়সী হয় এবং স্বামী বয়স্ক হয় তাহলে তার খুব দ্রুত বিধবা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মানুষ বয়সের সমতার কথা ভিন্নভাবে লক্ষ করে না। অবলা কুমারী মেয়ে অথবা বারো-তেরো বছরের অপরিপক্ক মেয়ের সঙ্গে ষাট-সত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধের বিয়ে দেয়। এখানেই সৃষ্টি হয় অনিষ্ট।

১. মেয়ে যদি সৎচরিত্রের অধিকারী হয়, নিজেকে পবিত্র রাখে তাহলে সে সারা জীবনের জন্য বন্দিত্বগ্রহণ করলো।

২. যদি অসৎচরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে নোংরামিতে লিপ্ত হয়। উভয় অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অপছন্দ, অসন্তুষ্টি এবং অনৈক্য সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় অবস্থা উভয়ের জন্য অসম্মানের। উভয়ের বংশের জন্য কলঙ্ক।

৩. সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হলো, বৃদ্ধ অধিকাংশ সময় আগে মারা যায়। অত্যাচারিতা মেয়েটি সমাজ-সংস্কারের ভয়ে বিধবা থেকে যায়। অনেক সময় এই দরিদ্রমহিলা খাওয়া-পরার মুখাপেক্ষী হয়। যদি সামাজিকভাবে মর্যাদাবান হয় তাহলে কোথাও কাজ করতে পারে না। যদি কাজ করার ইচ্ছা করে তাহলে অনেককে অন্যের ঘরে থাকতে হয়। আর যেহেতু অভিভাবক নেই তাই মানুষ তার দিকে খারাপ উদ্দেশে লালায়িত হয়। কখনো লোভ দেখিয়ে, কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো নানা ছলনায় ইজ্জত-সম্ভ্রম ও ধর্ম বিনষ্ট করে দেয়। বিশেষ করে যখন নিজের মধ্যেও প্রবৃত্তির তাড়না জাগ্রত থাকে। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ২৪]

কমবয়সী ছেলের বয়স্কনারীর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ক্ষতি

কিছুগোত্রের মাঝে উল্টো রীতিও চালু আছে। সেখানে বর ছোটো হয় এবং কনে বড়ো হয়। কিছু মূর্খমানুষ এমন করে যে স্বামী ছোটো এবং স্ত্রী অনেক বড়ো হয়। প্রথমে স্ত্রী যুবতী থাকে আর স্বামী থাকে দুধের বাচ্চা। বরং কখনো পার্থক্য এতো বেশি হয় যে, স্বামী স্ত্রীর বুকের দুধ খাওয়ার মতো থাকে। এসব জ্ঞানহীন মানুষগুলো ভাবে না যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো তাদের পরস্পর বুঝা-পড়া। আর ওপর্যুক্ত অবস্থায় যার আশাই করা যায় না।

এমন অবস্থায় দেখা যায়, স্ত্রীর যৌবনের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে আর স্বামীর কোনো যোগ্যতা নেই। সুতরাং সে অন্যকারো সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করছে বা দমবন্ধ করে দীর্ঘ যন্ত্রণায় ভুগছে। যদি স্বামী যুবকও হয় তাহলে সে সমতায় যেতে পারে না কারণ আগের ঘৃণা বিদ্যমান। সবচেয়ে বড়ো ঘৃণ্যবিষয় হলো, স্বামীর মর্যাদা শেষ হয়ে যায়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪]

যদি মেয়ের বয়স কম হয় তাহলে যখন সে দুর্বল হতে শুরু করে তখন স্বামীর বয়স বেশি হওয়াতে সে-ও দুর্বল হতে শুরু করে। দুইজন একই সঙ্গে বৃদ্ধ হতে শুরু করে। যখন স্বামীর বয়স বেশি হওয়া বিবেক সমর্থন করার পরও রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তা অপছন্দ করেছেন, তখন যা একেবারেই বিবেক প্রশ্রয় দেয় না তা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কীভাবে সমর্থন করবেন?

আরেকটি কারণ হলো, স্বামী আদেশদাতা। যদি স্ত্রীর বয়স বেশি হয় তাহলে সে স্বামীর অনেক আগে বৃদ্ধা হয়ে যায়। তখন 'আম্মাজানের' ওপর রাজত্ব করতে ভালো লাগবে? নিঃসন্দেহে সে আরেকজনকে কাছে টানবে। অনর্থক তিক্ততা সৃষ্টি হবে। অনেক গোত্রের মধ্যে এই বিপদ আছে; ছেলে হয় ছোটো আর মেয়ে যুবতী। উভয়ের মাঝে বিয়ে হয় এবং দুর্নাম রটে।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৭১]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মায়ের দিক থেকে সমতা থাকা উত্তম

যদি একটি উপকারের জন্য এবং একটি ক্ষতি থেকে বাঁচতে দরিদ্রমেয়েকে বিয়ে না করে তাহলে দোষের কিছু নেই। বরং এটাই ঠিক। অধিকাংশ সময় দরিদ্রমেয়ের ভেতর দুটি জিনিসের অভাব থাকে। এক. শিষ্টাচার ও সামাজিকতা এবং দুই. উদারতা। শিষ্টাচার জানা না থাকায় সে সেবা করার যোগ্যতা রাখে না। বরং তার দ্বারা কষ্ট হয়। উদারতা না থাকায় অনেক প্রয়োজনের সময় খরচ করতে কার্পণ্য করে। তার ভেতরগত স্বভাবের কারণে কৃপণতার সঙ্গে কাজ করে। যাতে অনেকের অধিকার নষ্ট হয়। অনেক সময় সম্মান নষ্ট হয়। কোনো অতিথিকে খাবার কম দেয়, কোনো মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে। যদি সে ছোটো থেকে খাওয়ানো দাওয়ানো এবং খাবার তৈরির মধ্যে থাকে তাহলে সে আনন্দ আয়োজনের জন্য মুখিয়ে থাকে।

অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, হঠাৎ ধন-সম্পদ দেখে চোখ ফুটে যায়। লাফাতে থাকে। কী করবে ভেবে পায় না। যেহেতু ভদ্রতা ও শিষ্টাচার জানা নেই তাই বাছ-বিচার ছাড়াই খরচ করতে থাকে। অধিকাংশ সময় নতুন টাকার মালিকগণকে কৃপণতা অথবা অপচয়ের রোগে পেয়ে বসে। তাদের মধ্যে ভারসাম্য কম থাকে। কারণ, তাদের সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার অভ্যাস নেই। সে ভারসাম্য শিখবে। অধিকাংশ সময় দেখা যায় এমন মেয়েলোকের স্বামীর ঘরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় না। আর্থিক অবস্থান ভিন্ন, মানুষগুলোও ভিন্ন। কখনো প্রকাশ্যে কখনো গোপনে যখন যেমন সুবিধা বাপেরবাড়ির গোলা ভরতে থাকে। সারাজীবন এই অভ্যাস দূর হয় না। এতে ঘরে বরকত নষ্ট হয়। পুরুষ আয় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় কিন্তু সে খরচ করতে করতে ক্লান্ত হয় না। এজন্য যেখানেই হোক নিজের সমপর্যায়ে কোথাও বিয়ে করা। যাতে বিয়ের কল্যাণগুলো রক্ষা পায়। কারো স্বভাব-চরিত্র ব্যতিক্রম। তার আলোচনা না করলেও হয়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৩]

দরিদ্রঘরের মেয়ে বিয়ে করবে না-কি ধনী ঘরের মেয়ে?

আগে জ্ঞানীগণ পরামর্শ দিতেন দরিদ্রমেয়ে বিয়ে করতে। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে এখন অনেক মানুষের মতামত হচ্ছে, দরিদ্রমেয়ে কখনো বিয়ে করা

উচিত নয়। কেননা সে নিজের দরিদ্র মা-বাবার পেছনে স্বামীর সবটাকা-পয়সা ব্যয় করে ফেলে। কিন্তু আমি এই মতামত দিই না। আমার মতামত হচ্ছে, মানুষ নিজের সমপর্যায়ের মেয়ে বিয়ে করবে। কারণ, নিজের চেয়ে বড়োঘরে যদি বিয়ে করে তাহলে প্রলুব্ধ হবে না। বাপের বাড়ির গোলাও ভরবে না। তবে বদমেজাজি হবে এবং তার দৃষ্টিতে স্বামীর কোনো মূল্য বা সম্মান থাকবে না। আর দরিদ্রমেয়ে বিয়ে করলে লোভে পড়বে। সবজিনিস দেখে তার লালা পড়বে এবং নিজের আপনজনদের আঁচল ভরবে।

এটা অভিজ্ঞতা থেকে বলা। আমার উদ্দেশ্য হলো, মেয়েরা খরচ করার ব্যাপারে এতোটা বেহিসেবি যার জন্য চিন্তাশীল মানুষের ভাবনার বিষয়– ধনীর মেয়ে নেবে না-কি গরিবের মেয়ে নেবে। তাদের বেহিসেবি হওয়ার কারণে অনেক জ্ঞানী মানুষ গরিবের মেয়ে বিয়ে করা দোষণীয় মনে করছে।

[দীন দুনিয়া আসবাবে গাফলত: পৃষ্ঠা: ৪৯৫]

অধ্যায় ।৫।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিয়ের জন্য পাত্রকে কেমন হতে হবে

মেয়ে বিয়ে দেয়ার সময় পাত্র ধার্মিক কী-না তা লক্ষ রাখতে হবে। ধার্মিকতা ছাড়া মানুষের অধিকার রক্ষা হয় না। যেমনটি দেখা যায়, যেলোক ধার্মিক নয় সে মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। পাত্র সবদিক থেকে উপযুক্ত হয় কিন্তু দীনদার নয় তবুও তার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবে না।

[মালফুজাতে খায়রাত: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩২]

যতোক্ষণ মানুষ ধর্মপরায়ণ না হয় ততোক্ষণ তার কোনো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কোনো কাজের কোনো সীমা নেই অর্থাৎ তার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। যদি বন্ধুত্ব হয় তাহলে সীমা ছাড়াবে আবার শত্রুতা হলেও সীমালঙ্ঘন করবে। আর যার কাজের কোনো ভারসাম্য নেই সে নিশ্চত বিপদজনক। সবকিছু যথাযথ করাই সবচেয়ে বড়ো পূর্ণতা। [আল ইফাজাত: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২০২]

ধার্মিকতার পরিচয়

ধর্মের কী-কী শাখা রয়েছে আজ মানুষ তা জানে না। ফলে তারা ধর্মকে নামাজ, রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। ইসলামের মৌলিক শাখা হলো পাঁচটি: ১.বিশ্বাস; ২.ইবাদত; ৩. লেনদেন; ৪. সামাজিক আদান প্রদান বা আচরণ এবং ৫. চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধি। [হুকুকুল ইলম: পৃষ্ঠা: ২]

সুন্দর তাকে বলা হবে যার নাক, কান, চোখ সবসুন্দর। প্রত্যেক অঙ্গ যথাযথ। যদি সবঠিক কিন্তু চোখ কানা অথবা নাক বোঁচা তাহলে সে সুন্দর নয়। এমনিভাবে ইসলাম তার সবশাখার সমন্বিত একটি নাম।

[তাজদিদে তালিম: পৃষ্ঠা: ২২৭]

সামাজিক আচরণ, আদান প্রদানও ইসলামের একটি শাখা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটাকে সামান্য বিষয় মনে করে এবং ওজিফা [পির কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিদিনের নফল ইবাদত]-কে দীনদারি ও আবশ্যক মনে করে। সামাজিক শিষ্টাচারের মূলকথা হলো, তার থেকে কেউ কষ্ট পাবে না। যদি কারো লেনদেন ঠিক হয়ে যায় এবং সে নামাজ পড়ে তাহলে সে-ই প্রকৃত ধার্মিক। আল্লাহর নৈকট্য সে লাভ করবে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৩]

একবুজুর্গের ঘটনা

একবুজুর্গের ঘটনা। তার একটি মেয়ে ছিলো। যার ৰিয়ের প্রস্তাব খুব বেশি পরিমাণে আসছিলো। তিনি তাঁর একজন ইহুদিপ্রতিবেশীর কাছে পরামর্শ চাইলেন। বললেন, অমুক অমুক জায়গা থেকে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। আপনার কোন জায়গাটি উত্তম মনে হয়? ইহুদি আপত্তি করে বললেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন না। কারণ আমি অন্যধর্মের মানুষ। আর অন্যধর্মের মানুষের পরামর্শের কী মূল্য? বুজুর্গ বললেন, আপনি যদিও মুসলিম নন তবুও অভিজাত-সম্ভ্রান্তমানুষ। আপনি ভুল পরামর্শ দেবেন না। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে পরামর্শ দিন। তখন ইহুদি বললেন, আমি শুনেছি, আপনাদের নবি মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন–

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ

"চারটি গুণ দেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ, তার সৌন্দর্য, তার ধার্মিকতা। সুতরাং তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও।"

এর থেকে জানা যায় আপনাদের ধর্ম ইসলামে সবচেয়ে বেশি বিবেচনার বিষয় দীন। আমার ধারণামতে যতোজন প্রস্তাব দিয়েছে তাদের কারো মাঝেই পরিপূর্ণ দীন নেই। যে তালিবুলইলম [দীনশিক্ষার্থী] আপনাদের মসজিদে থাকে আমার কাছে সে-ই বড়ো ধার্মিক। সবসময় আল্লাহর কাজে লেগে থাকে। আপনি আপনার মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিন। ইনশাল্লাহ বরকত হবে। বুজুর্গ তেমনটিই করলেন। অতঃপর তার মেয়ে সারাজীবন শান্তিতে ছিলো।

[আততাবলিগ: পৃষ্ঠা: ১৩০-১৪০]

মেয়ে ও বোন বিয়ে দেয়ার সময় ছেলের যেসব বিষয় দেখতে হয়

অনেকে বলেন, মেয়ের বিয়ে নিয়ে খুব চিন্তিত। আশানুরূপ কোনো প্রস্তাব আসছে না। কোনো জায়গা থেকে দাড়িওয়ালা ছেলের প্রস্তাব আসলে দেখা যায় সে হতদরিদ্র। আবার যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকে দেখা যায় তার দাড়িসাফ। কিছুপ্রস্তাব শুধু এজন্য ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। দোয়া করবেন আল্লাহ যেনো ইজ্জত রক্ষা করেন। মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে লজ্জার মুখোমুখি হতে না হয়। অনেকে বলছে, ভাই এই খেয়াল ছেড়ে দিন। আজকাল দাড়িওয়ালা ছেলে সহজে মিলবে না।

উত্তরে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেন, বাস্তবেই কঠিন। আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিচ্ছি না। আমার ধারণা, বর্তমান সময়ে ধার্মিকতা পুরোপুরি

দাড়িতে নিহিত নয়। একজন দাড়িকামানোর গোনাহ করছে। অপরজন প্রবৃত্তিপূজার গোনাহ করছে। তাহলে শুধু দাড়ি দিয়ে কী হবে? হলে সত্যিকার ধার্মিক হও। যা খুবই দুষ্প্রাপ্য। যদি নিচের বিষয়গুলো খেয়াল করা হয় তাহলে কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে।

১. শুধু কয়েকটি বিষয় দেখে নেবে। যেমন, ইসলামের মৌলিকবিশ্বাসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করে না অথবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে না।

২. স্বভাব-চরিত্র ভালো হয়। যেমন, আলেম ও বুজুর্গদেরকে সম্মান করে।

৩. নম্রস্বভাবের হবে।

৪. পরিবার-পরিজনের অধিকার আদায়ের আশ্বাস পাওয়া।

৫. প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ থাকা আবশ্যক। কারো মধ্যে এসব গুণ পাওয়া গেলে তাকে বেছে নেবে। এরপর যখন আসা-যাওয়া হবে, হৃদ্যতা সৃষ্টি হবে তখন অসম্ভব নয় এই ছেলে দাড়ি রেখে দেবে।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৩১১, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত]

৬. উপার্জনে সক্ষম হবে।

৭. অন্যের তুলনায় বেশি পার্থক্য হবে না।

৮. ধার্মিকতার অন্যান্য বিষয়গুলো তালাশ করবে না। নয়তো হাদিসে যে সাবধানবাণী এসেছে তা বাস্তবায়িত হবে। বর্ণিত হয়েছে, যখন স্বভাব-চরিত্র ও ধার্মিকতার ক্ষেত্রে কুফু পাওয়া যায় তখন বিয়ে দিয়ে দাও। নতুবা অনেক বড়ো বিশৃংখলা হবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩১]

বিদেশিছেলেকে বিয়ে করবে না

বিদেশিছেলেকে বিয়ে করা সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক।

[মালফুজাতে খাবরাত: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩২]

কাছের আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করার ক্ষতি

অভিজ্ঞজন নিষেধ করেন নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করতে। কেননা এতে সন্তান দুর্বল হয়। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬]

তার কারণ হলো, সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য যেমন শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ শর্ত তেমনি অন্তরের ভালোবাসা, আকর্ষণ-বাসনারও একটি স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। কেননা তা শারীরিক মানসিক সুস্থতার পূর্বশর্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে গর্ভবতী হওয়া এবং গর্ভধারণ করা নির্ভর করে একই সঙ্গে বীর্যপাত হওয়ার ওপর। সেটার জন্য ভালোবাসা ও মনের আকর্ষণ প্রয়োজন। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৭]

মেয়ের অভিভাবকগণ তাড়াহুড়ো করবে না বরং ভালোভাবে খোঁজ-খবর নেবে

মানুষ মেয়েদের বিয়েকে রসিকতা মনে করে। কোনোকিছু না দেখেই জায়গা অজায়গায় বিয়ে দিয়ে দেয়। যেমন, একমহিলাকে নিষেধ করার পরও 'আমি মরে যাবো' এই ভয়ে সে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। পরে জানা গেলো, স্বামী বড়ো অত্যাচারী ছিলো। একজন ইংরেজের সঙ্গে বিবেদে লিপ্ত হয়। এরপর শাস্তির ভয়ে যুদ্ধে নাম লেখায়। সে সবার সঙ্গে বিবাদে জড়ায়। এখন স্ত্রীকে মানুষের বিরোধিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখন বলে, কী করবো, তার ভাগ্য। আমার মনে চায় এমন মানুষের গলা টিপে ধরি। তাদের ভাবটা এমন– আমাদের কোনো ভুল হয়নি, ভুল হয়েছে আল্লাহর। নাউজুবিল্লাহ! [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪০৪]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের জন্য সর্বোত্তমপাত্রী

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন নারী সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন–

إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ-

"যখন স্বামী তার দিকে তাকায় স্বামীর মনকে প্রফুল্ল করে দেয়। কোনো আদেশ করলে তাকে সন্তুষ্ট করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ ও নিজেকে রক্ষা করে।" [নাসায়ি]

হজরত মাকাল ইবনে ইয়াসার [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেন–

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

"তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো যারা অধিকভালোবাসে এবং অধিকসন্তান জন্ম দেয়। কেননা আমি তোমাদের আধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করবো।" [আবুদাউদ ও নাসায়ি]

যদি বিধবানারী হয় তবে প্রথম বিয়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যাবে সে স্বামীকে ভালোবাসে কী-না। সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখে কী-না। আর কুমারী হলে তার সুস্থতা এবং তার বংশের বিবাহিত অন্যান্য মেয়ের থেকে এসব ব্যাপারে জানা যাবে। [হায়াতুল মুসলিমিনঃ পৃষ্ঠাঃ ১৮৮]

স্ত্রী ও ছেলের বউ নির্বাচনে যা দেখতে হয়

বর্তমান যুগে কনের মধ্যে অধিক সৌন্দর্য এবং বরের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা হয়। সবচেয়ে কম দেখা হয় ধার্মিকতা। অন্যান্য গুণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। অথচ সবচেয়ে কম দেখার বিষয় সৌন্দর্য এবং বেশি দেখার বিষয় হলো ধার্মিকতা। হাদিসশরিফে পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে এসেছে–

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ

“চারটি গুণ দেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ, তার সৌন্দর্য , তার ধার্মিকতা। তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও।

হাদিসে সম্পদ এবং সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ না করে ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৭]

মেয়েদের আধুনিকশিক্ষা ও অধুনাশিক্ষিত মেয়ে বিয়ে

কিছু মানুষ এফএ পাস, এমএ পাস ছেলে খোঁজে। আফসোস! কিছু আধুনিক রুচির মানুষ আধুনিক শিক্ষিত মেয়ে খোঁজে। অথবা শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বা প্রফেসর হয়েছে এমন। আপনারা সেই পণ্ডিতদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের উদ্দেশ্য কী? যদি বলে, তাদের বোঝা আমাদের ওপর হাল্কা হবে, সে নিজেও উপার্জনে সাহায্য করবে; তবে এটা সীমাহীন কাপুরুষিকতা যে, পুরুষ হয়ে নারীর কাছে ধরণা দেবে, তার অনুগৃহীত হবে। এটা সাধারণ আত্মমর্যাদাবোধেরও পরিপন্থী।

আর যদি উদ্দেশ্য হয় এমন– মেয়েরা সভ্য-শিষ্ট হবে। আমাদের অধিক সুখ-শান্তিলাভ হবে। তাহলে ভালোভাবে বুঝে নিন, সুখ-শান্তির জন্য শিক্ষা-শিষ্টাচার যথেষ্ট নয় বরং এর জন্য একনিষ্ঠতা, আনুগত্য ও সেবার মানসিকতা অধিক প্রয়োজন। যদি আদব-রীতি একটু কমও জানে তা সহ্য করা যায়। যদিও কখনো কখনো কষ্ট হয় কিন্তু তা খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় এবং তার প্রভাব বাকি থাকে। আর যদি উচ্চ আদব-রীতির অধিকারী হয় এবং এসব গুণ না থাকে তাহলে সেবা কীভাবে করবে? কেননা অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায়, আধুনিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়া হলো, অহংকার, স্বার্থপরতা, আত্মমুখিতা, নির্ভয়তা, স্বাধীনতা, নির্লজ্জতা, চতুরতা, কপটতা ইত্যাদি মন্দস্বভাবের সৃষ্টি। যখন তার মস্তিষ্ক অহংকারে ভরা তখন সে তোমার সেবা কেনো করবে? বরং স্বার্থপরতার কারণে উল্টো তোমার কাছ থেকে নিজের অধিকার ষোলো আনা দাবি করবে। যাতে তোমার সুখ-স্বস্তি নষ্ট হবে। সে নিজেই তোমার কাছ থেকে সেবা চাইবে। তুমি যদি তার কাছে সেবা চা-ও তবে সে একজন অভিজাত নারী মনে করে তোমার কথার উত্তর দিয়ে দেবে। বলবে, এটা আমার দায়িত্ব নয়। বরং যেটা তার দায়িত্ব তার মধ্যে অভদ্রতার কারণে বা অসুস্থতার অজুহাতে সরাসরি অস্বীকার করবে। নিজের অধিকার পুরোপুরি আদায় করবে। যদি টাল-বাহানা করো তাহলে আদালতে মামলা করে দেবে।

যদি বলো, এমনটি খুব হয় তাহলে বলবো, অধুনাশিক্ষিতা বিবেচ্য নয়; মূলকথা হলো, আধুনিক শিক্ষার চেয়ে অশিক্ষিত থাকা অনেক ভালো। কারণ, শিক্ষিত না হলে বড়োজোর উত্তমশিক্ষা অর্জন হলো না, তবে এর ফলশ্রুতিতে মন্দচরিত্রও সৃষ্টি হবে না। বর্তমানে যাকে ভদ্রতা বলা হয় তা হলো অভিনয়, নিজের দোষ লুকানো, প্রতারণা ও কপটতা। আর নারী মধ্যে এসব গুণ থাকার অর্থ সে জাহান্নামতুল্য। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৫ ও ৪৭]

ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করা উত্তম

মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার দিকটি খোঁজা ভালো। কারণ, ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ বানায় যদি সে তা পালন করে। আশার কথা হলো, যখন কোনো মানুষ ধর্মীয় শিক্ষালাভ করে তখন কোনো না কোনোদিন তার পালনের সুযোগ হয়। তাই আমলহীনতার ত্রুটিও যদি থাকে তাহলেও তা স্থায়ী কিছু নয় বরং অস্থায়ী। এক মিনিটে তা শেষ হয়ে যেতে পারে। মোটকথা ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৭]

সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করার পরিণতি

সম্পদ ও সৌন্দর্যের স্থায়িত্বকাল বেশি নয়। সম্পদ একরাতেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। সৌন্দর্য এক অসুস্থতায় শেষ হয়ে যেতে পারে। কিছু জিনিস আছে যা একবার সৌন্দর্য হারালে পরে রূপ আর ফিরে আসে না। চোখ গলে গেলো, বসন্ত হলো কিন্তু দাগ গেলো না বা এই জাতীয় কোনো রোগ।

যখন বিয়ের উদ্দেশ্য ছিলো সম্পদ ও সৌন্দর্য এবং তা শেষ হয়ে গেলো তখন সমস্ত ভালোবাসা যার ভিত্তি সম্পদ ও সৌন্দর্য, তা-ও শেষ হয়ে যাবে। এরপর স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের দৃষ্টিতে ঘৃণা এবং ক্রোধের কারণ হবে। শেষপর্যন্ত সম্পর্ক টেকানো কঠিন হয়ে যায়। যদি সম্পদ ও সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকে তবুও অধার্মিক ব্যক্তির না চরিত্র ঠিক থাকে না কাজ ও লেনদেন ঠিক থাকে। তার কথার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা তার কোনো কাজ ভারসাম্যপূর্ণ নয়। বন্ধুত্বের কোনো সীমা থাকে না। শত্রুতারও কোনো সীমা থাকে না।

চরিত্রহীনতা, অসৎলেনদেন, অসৎকাজ, স্বার্থপরতা, অধিকারহরণ ইত্যাদি মন্দস্বভাব যা ঘৃণা সৃষ্টি করে–সারাদিন যদি তার মুখোমুখি হতে হয় তাহলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা কতোদিন টিকবে? পরস্পরের মধ্যে অসন্তোষে, অনৈক্য ও হিংসা-বিদ্বেষ শুরু হবে। এমনকি বিয়ের সব কল্যাণ ও উপকার নষ্ট হবে।

[ইসলাহে ইনকিলাব]

অনস্বীকার্য একসত্য

আমি নিজে দেখেছি, স্ত্রী সৌন্দর্যে হুরতুল্য আর ধন-সম্পদে কারুণতুল্য কিন্তু স্বামীর ধর্মহীনতার কারণে অথবা স্ত্রীর দুশ্চরিত্র, বদমেজাজ ও চালচলনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা পর্যন্ত হয় না। এ ওকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর ও একে দেখে নাক সিঁটকিয়ে চলে যায়। অঢেল সম্পদ থাকার পরও এক একটি পয়সার জন্য অন্যবাড়ি কাজে যেতে হয়। আমি অনেক জায়গায় দেখেছি, চরম ঘৃণার কারণে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে পর্দা করে। এটাই হলো সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করার পরিণতি। [তালিমুদ্দিন]

প্রেমের সম্পর্ক হয়ে গেলে বিয়ে পড়িয়ে দেবে

যদি ঘটনাক্রমে কোনো অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কোনো পুরুষের প্রেমের সম্পর্ক হয়ে যায় তাহলে উত্তম হলো তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেয়া। [তালিমুদ্দিন]

স্ত্রী অতিরিক্ত সুন্দর হওয়া কখনো ঝামেলার কারণ

আজকাল মানুষ বিয়ে করার জন্য রূপ-সৌন্দর্য খোঁজে। অথচ শান্তি ও ঝামেলামুক্ত থাকার জন্য স্ত্রী কম সুন্দরী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, রূপ-সৌন্দর্য কম হলে কুদরতিভাবেই নিরাপত্তালাভ করা যায়। রূপ-সৌন্দর্য আল্লাহর দান কিন্তু এর মধ্যে আজকাল ফেতনার আশঙ্কা বেশি। কখনো বাবা-মাকে অসন্তুষ্ট করে সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। স্ত্রীর কারণে দীন থেকে দূরে সরে যায়। যার কারণ সুন্দরী স্ত্রীর ভালোবাসা। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭২১]

একসুন্দরী নারীর উপাখ্যান

কিছুদিন আগে একজন মহিলার চিঠি আসে। মহিলা প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ আমার কাছে বায়াত হয়েছে। সে খুবই ধার্মিক। স্বামীর কষ্ট দেয়া, অভদ্রতা ও অকৃজ্ঞতার অভিযোগ জানিয়েছে। যা পড়ে অন্তরে অনেক দুঃখ এবং ব্যথা লাগলো। মানুষেরা সীমাহীন অত্যাচারে উঠে-পড়ে লেগেছে। ওই অসহায় মহিলা এতোটুকু পর্যন্ত লিখেছে, কাঁদতে কাঁদতে আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। কখনো কখনো মনে চায়, পর্দা ছেড়ে বের হয়ে যাই অথবা কূপে ঝাঁপ দিয়ে মারা যাই। কিন্তু দীনবিরোধী বা শরিয়তনিষিদ্ধ বলে কিছু করতে পারি না। মনকে বুঝিয়ে থেমে যাই। দিন-রাত কাঁদা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।
বড়ো অন্যায় কথা। বেচারি কাঁদা ছাড়া আর কি-ই বা করবে? তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে সতেরো বছর যাবৎ। লোকটা খুব আশা-আকাঙ্খা নিয়ে বিয়ে করেছিলো। সে সময় রূপ-লাবণ্য ভালো ছিলো। তখন বিভিন্ন অনুরোধ নিয়ে

লাটিমের মতো ঘুরতো। এখন সে দুর্বল হয়ে গেছে। তাই চোখ তুলেও তাকায় না। ভরণ-পোষণের পর্যন্ত মুখাপেক্ষী। স্বামী বয়সে ছোটো আর স্ত্রী বৃদ্ধা। এই পাষাণ, নির্দয় লোকটার পরিণতি কী হবে। কোনো কথায়ও কাজ হয় না। বেচারি যদি বলে আমার বিগতদিনের সেবার কি মূল্য? তাহলে বলবে, তুমি আমার কী সেবা করেছো? অজানা সেবার তালিকা মাথায় থাকে যা সে করতে পারেনি। এটাই হলো পরিণতি রূপ-লাবণ্যের ওপর ভিত্তি করে ধর্মবিমুখ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করার।

সম্পদের জন্য বিয়ে করার নিন্দা

অনেকে শ্বশুরবাড়ির সম্পদ দেখে বিয়ে করে। বাস্তবে এটা মেয়েপক্ষের স্বামীর সম্পদ দেখার চেয়েও নিন্দনীয়। কোনো অবস্থাতে এর প্রাধান্য না পাওয়াটাই বিবেকের দাবি। কেননা স্বামীর ওপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং এই সূত্রে তার আর্থিক সামর্থ দেখা দোষের কিছু নয়। বরং একধরনের আবশ্যকীয় কল্যাণকর কাজ। হ্যাঁ, তবে এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা–যেমন সব প্রয়োজনীয় গুণের ওপর সম্পদের প্রাধান্য দেয়া নিন্দনীয়।
কিন্তু মেয়ের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এই আশায় যে, তা থেকে আমি উপকৃত হবো, আমার ওপর তার বোঝা হালকা হবে। এটা সীমাহীন হীনমন্যতা ও কাপুরুষিকতার শামিল। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৪২]

যৌতুকের লোভে বিয়ে করার পরিণতি

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, ধনী মেয়েরা দরিদ্রপুরুষকে কখনো মূল্যায়ন করে না। বরং তুচ্ছ ও সেবকজ্ঞান করে। ছেলের বাবা-মা যদি মনে করে এমন মেয়ে বিয়ে করাবো যেখান থেকে অনেক যৌতুক পাওয়া যাবে তাহলে তা বোকামি ছাড়া কিছু না। কেননা যৌতুকের মালিক স্ত্রী। অন্যদের তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক বা তার ওপর কিসের দাবি। যদি মনে করে ঘরে থাকবে এতে আমাদেরও কাজে লাগবে তাহলে তা হবে হীনমন্যতা ও লোভ।
আর যদি তা মেনেও নেয়া হয় তাহলে তা বর বা ছেলের ক্ষেত্রে ভাবা যায় কিন্তু এর সঙ্গে শ্বশুর-শ্বাশুরির কী সম্পর্ক? আজকাল ছেলেরা নিজের ইচ্ছায় বা বৌয়ের ইচ্ছায় পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং সমস্ত আশার গুড়েবালি।
[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২]

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি যৌতুক দেয়

যদি স্বামীর আশা, চাওয়া, অপেক্ষা ইত্যাদি ছাড়াই কোনো উপঢৌকন স্ত্রীর বাড়ি থেকে দেয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

"আল্লাহ আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন অতঃপর আপনাকে সম্পদ দান করেছেন।"

وَاشْتُرِطَ عَدَمُ التَّطَلُّعِ وَالتَّشَرُّفِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَتَاكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

শর্ত করা হয়েছে প্রত্যাশা না করা এবং ইঙ্গিত না দেয়াকে। প্রমাণ রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বাণী–

"তোমার কাছে যা কোনো ইঙ্গিত ছাড়া আসবে তা গ্রহণ করো। সম্পদের পেছনে নিজেকে ব্যস্ত করো না।" [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২]

সম্পদের অপেক্ষা করা এবং তার দিকে তাকিয়ে না থাকা। কেননা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, "যা কিছু তোমার কাছে নিজের চাওয়া ছাড়া আসবে তা গ্রহণ করবে। যা তোমার কাছে আসবে না তার পেছনে পড়বে না।

বিয়ের আগে দোয়া ও ইস্তেখারার প্রয়োজনীয়তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিয়ের আগে দোয়া ও ইসতেখারার প্রয়োজনীয়তা

দোয়া এমন একটি জিনিস যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্য সমান উপকারী হিসেবে গঠন ও অনুমোদন করা হয়েছে। কোরআন-হাদিসে দোয়ার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বহুজায়গায় দোয়ার মর্যাদা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে−

اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَکُمْ*

"দোয়া করো আমি সাড়া দেবো।"

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন−

اَلدُّعَاءُ أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ*

"বড়ো ইবাদত হচ্ছে দোয়া।"

আরো বর্ণনা করেন, "যার দোয়া করার সুয়োগ হলো তার জন্য গ্রহণীয় হওয়ার দরোজা খুলে গেলো।"

অপর বর্ণনায় এসেছে, "তার জন্য জান্নাতের দরোজা খুলে গেলো।"

এক বর্ণনায় এসেছে, "রহমতের দরোজা খুলে গেলো।"

ভাগ্যবদল কেবল দোয়া দ্বারাই সম্ভব। দোয়া সবধরনের চেষ্টা ও সতর্কতা থেকে উপকারী। জাগতিক বিষয়েও দোয়া করার নির্দেশ এসেছে।

দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। কিন্তু কবুল হওয়ার আঙ্গিক বিভিন্ন প্রকার। কখনো সরাসরি কাঙ্ক্ষিত বস্তুটা মিলে যায়, কখনো পরকালের ভাণ্ডারে পুণ্য হিসেবে জমা হয়। কখনো দোয়ার বরকতে বিপদ কেটে যায়। আল্লাহর দরবারে হাত উঠালে কিছু না কিছু পাওয়া যায়। [মোনাজাতে মকবুলের ভূমিকা: পৃষ্ঠা: ১২-১৩]

দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্থা ও চেষ্টা থাকতে হবে

দোয়ার ব্যাপারে মানুষ একটি ভুল করে। তারা শুধু দোয়াকেই যথেষ্ট মনে করে, চেষ্টা করে না। অথচ চেষ্টা করাটাও দোয়ার অংশ। কেননা দোয়া দুই ধরনের **এক.** মৌখিক দোয়া এবং **দুই.** কর্মগত দোয়া। কাজের মাধ্যমে দোয়ার অর্থ হলো, চেষ্টা ও পরিশ্রম করা।

দোয়ার অর্থ যদি তাই হতো যা তোমরা বুঝো তাহলে তোমরা বিয়ে করো না। সন্তানের আশা করি কিন্তু বিয়ে করবো না। পির সাহেবের দোয়ার ওপর আমার

আস্থা আছে। বিষয়টি এমনই। এখন কি সন্তান লাভ করা সম্ভব? দোয়ার অর্থ হলো, চেষ্টার যতো দিক আছে অর্থাৎ বাহ্যিক উপকরণ ও প্রচেষ্টা চালানো। এরপর দোয়াও করো। একটি হাদিস থেকে এমনটি জানা যায়, إِعْقِلْ ثُمَّ تَوَكَّلْ "উটের রশি বাঁধো এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।"

[জরুরাতে তাবলিগ, মোলহাকায়ে দাওয়াত ও তাবলিগ: পৃষ্ঠা: ৩২৭]

সমস্ত চেষ্টা একদিকে আর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও দোয়া একদিকে। মানুষ তা ছেড়ে দিয়েছে। দোয়া একাগ্রতার সঙ্গে হওয়া উচিত। ফিকাহবিদগণ লিখেন, দোয়ার মধ্যে কোনো বিশেষ দোয়াকে নির্দিষ্ট করবে না। এতে একাগ্রতা নষ্ট হয়।

কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও শিষ্টাচার

১. দোয়ার অর্থ হলো, আমি আপনার অনুমতিসাপেক্ষে এমন জিনিস কামনা করছি যা আমার দৃষ্টিতে কল্যাণকর। যদি আপনি ভালো মনে করেন তাহলে দেবেন, নয়তো দেবেন না। আমি সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট। সেই সন্তুষ্টির নিদর্শন হলো, কবুল না হলে অভিযোগ না করা। মন খারাপ না করা।

২. আমাদের ললাটলিখন সম্পর্কে জ্ঞান নেই। তাই যেটা আমাদের দৃষ্টিতে ভালো মনে হয় তা চাইতে পারি। যদি তার বিপরীতে কল্যাণ থাকে তাতে খুশি থাকতে হবে। [আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৪৬]

৩. দোয়ার মধ্যে নিজের থেকে পদ্ধতি নির্ধারণ করা। যেমন, এমনটি হোক এরপর এমনটি হোক। দোয়ার মধ্যে বাড়াবাড়িও শিষ্টাচার বহির্ভূত। এটা কেমন যেনো আল্লাহকে সিদ্ধান্ত জানানো। যেমন কোনো বাচ্চা তার মাকে বললো, মা আমাকে চার নম্বর রুটিটা দেবেন। ভালো-মন্দে তার যায় আসে না। রুটি যেমনই হোক সেই রুটিই তার দরকার।

[আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩০]

৪. যেবিষয় সন্দেহপূর্ণ হয় কোনো নিদর্শন দ্বারা তার কোনোদিক প্রাধান্য না পায় সে ব্যাপারে সন্দেহের সঙ্গে দোয়া করা উচিত। আর যেবিষয়ের একটি দিক নিজের কাছে স্পষ্ট হয় নিদর্শনের মাধ্যমে কোনো একদিক ভালো বা মন্দ স্পষ্ট হলে সে বিষয়ে সন্দেহ ছাড়া দোয়া করা উচিত। সন্দেহের সঙ্গে দোয়া করার অর্থ হলো, হে আল্লাহ! বিষয়টি যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে দান করুন। নয়তো দান করবেন না। [আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩০]

ভালোস্ত্রীলাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আমার প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের চোখে শীতলকারী ও আমাদেরকে খোদাভীরুলোকদের নেতা বানিয়ে দিন!"

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُعْطِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তমসম্পদ, ভালোস্ত্রী ও সুসন্তান কামনা করি যা আপনি মানুষকে দান করেন। যারা নিজেরা ভ্রান্তকারী হবে না এবং অন্যকে ভ্রান্ত করবে না।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ-

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও সম্পদের ব্যাপারে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি।"

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ أَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ قُلُوْبِنَا وَ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অন্তর এবং আমাদের স্ত্রীগণ ও পরিবারে বরকত দান করুন! আপনি আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু। [মোনাজাতে মকবুল]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ إِمْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِيْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ وَبَالًا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন স্ত্রীলোক থেকে আশ্রয় চাই, যে আমাকে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই বৃদ্ধ করে দেবে। এমন সন্তান থেকে আশ্রয় চাই যে আমার জন্য বিপদ হবে। এমন সম্পদ থেকে আশ্রয় চাই যা আমার জন্য শাস্তির কারণ হবে।"

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِيْنِيْ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ صَاحِبٍ يُؤْذِيْنِيْ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ أَمَلٍ يُلْهِيْنِيْ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নারীদের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি এমন কাজসমূহ থেকে আশ্রয় চাই যা আমাকে অপদস্ত করবে।

এমন সাথী থেকে আশ্রয় চাই যে আমাকে কষ্ট দেবে। এমন কামনা-বাসনা থেকে আশ্রয় চাই যা আমাকে অমনোযোগী করে দেবে।"

এই দোয়াগুলো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর 'মোনাজাতে মকবুল' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। শুরুতে এবং শেষে তিনবার করে দরুদশরিফ পড়ে নেবে।

ইস্তেখারার দোয়া

যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা করবে তখন দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে এবং এই দোয়া পড়বে। যদি মুখস্থ না থাকে তাহলে দেখে পড়বে। আর দেখে পড়তে না পারলে কাউকে দিয়ে পড়িয়ে অথবা নিজের ভাষায় পড়বে। তবে আরবিতে দোয়া পড়া উত্তম ও সুন্নত।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَ يَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার কাছে কল্যাণকামনা করছি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী। আপনার কাছে ক্ষমতাপ্রার্থনা করছি আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী। আপনার মহাঅনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা নিশ্চয় আপনি ক্ষমতা রাখেন, আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জানেন আমি জানি না। আপনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। হে আল্লাহ! এ বিষয়টি যদি আমার জন্য, আমার ধর্ম ও জীবযাপন এবং শেষ পরিণতির জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে তা আমার জন্য নির্বাচন করুন। আমার জন্য তা সহজ করে দিন। এ বিষয়ে আমাকে বরকত দান করুন। আর বিষয়টি যদি আমার জন্য, আমার ধর্ম ও জীবনযাপন এবং শেষ পরিণতির জন্য অকল্যাণকর জানেন তাহলে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন।

আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করুন তা যেমনই হোক এবং আমাকে তাতে সন্তুষ্ট করুন।" [মোনাজাতে মকবুল: পৃষ্ঠা: ২৪৮]
দাগটানা স্থানে যেকাজের জন্য ইস্তেখারা করা হচ্ছে তার ধ্যান করবে।

বিয়ের জন্য ইস্তেখারা করা প্রয়োজন

ইস্তেখারা করতে ভয় পাওয়া আল্লাহর সঙ্গে গোপন বেয়াদবি। এর বাস্তবতা হলো, আল্লাহর ওপর এতোটুকু আস্থা নেই যে, আল্লাহর যা করবেন ভালো করবেন। নিজের বুদ্ধিতে যেটা ভালো মনে হয় সেটাই ভালো মনে করে। এজন্য সন্দেহের বাক্য– "হে আল্লাহ! যদি ভালো হয় তাহলে দান করবেন" উচ্চারণ করে না।

খাজা সাহেব বলেন, 'ভালোকাজে ইস্তেখারা করার প্রয়োজন নেই।'

প্রত্যেক কাজের মধ্যে ভালো ও মন্দ নিহিত থাকে। হজরত জয়নব [রদিয়াল্লাহু আনহা]-কে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সন্তুষ্টি সত্ত্বেও এবং এ কাজ কল্যাণকর হওয়াতে সন্দেহ না থাকার পরও তিনি বলেন,

لَا حَتّٰى اَسْتَشِيْرَ رَبِّيْ

"আমি এখন বিয়ের ব্যাপারে কিছুই বলবো না। যতোক্ষণ না নিজপ্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করবো।"এরপর তিনি ইস্তেখারা করেন।

এটা কি ইস্তেখারা করার মতো কোনো স্থান? প্রত্যেক কাজে ভালো-মন্দের সম্ভাবনা থাকে। এমনকি এমন স্পষ্ট ভালোকাজেও মন্দের সম্ভাবনা থাকে। যেমন, বিয়ের প্রাপ্য আদায় হলো না। সেবা ও আনুগত্য ঘাটতি হলো। তাহলে এমন বিয়ে বিপদের কারণ হবে। এজন্য হজরত জয়নব [রদিয়াল্লাহু আনহা] ইস্তেখারা করার প্রয়োজন বোধ করেন। [হুসনুল আজিজ: পৃষ্ঠা: ২৩৪-২৩৫]

ইচ্ছা করার আগে ইস্তেখারা করতে হবে

ইস্তেখারা করার নিয়ম এটা নয় যে, প্রথমে কাজের ইচ্ছা করে নেবে এরপর নামে মাত্র ইস্তেখারা করবে। বরং ইচ্ছা করার আগে ইস্তেখারা করে নেবে। যাতে অন্তরে প্রশান্তিলাভ হয়। মানুষ এই ক্ষেত্রে বড়ো ভুল করে। ইস্তেখারার সঠিক নিয়ম হলো, প্রথমে ইস্তেখারা করবে এরপর যেদিকে অন্তর বেশি ঝুঁকবে সে কাজটাই করবে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৩৩]

যেসব বিষয়ে ইস্তেখারা করতে হয়

ইস্তেখারা এমন বিষয়ে বৈধ যার উভয়দিক শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধতার বিচারে সমান। যে কাজের ভালো-মন্দ, বৈধতা ও অবৈধতা শরিয়তের দলিল দ্বারা নির্ধারিত সেকাজে ইস্তেখারা করা জায়েজ নয়। [আনফাসে ইসা: পৃষ্ঠা: ৩১৪]

ইস্তেখারা করতে হয় সন্দেহপূর্ণ স্থানে। সন্দেহের অর্থ উভয়দিকের উপকারিতা সমান। যখন একদিকের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হয়ে যায় তখন ইস্তেখারার কী অর্থ? [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৪৪]

ইস্তেখারা এমন বিষয়ে করতে হয় বাহ্যিকদৃষ্টিতে যাতে লাভ-ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। [আনফাসে ইসা: পৃষ্ঠা: ৪০]

ইস্তেখারা এমন বিষয়ে বৈধ যার মধ্যে লাভ-ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। যেকাজে প্রাকৃতিকভাবে বা শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্ষতি সুনিশ্চিত সেকাজে ইস্তেখারা করার সুযোগ নেই। যেমন, নামাজ পড়ার ব্যাপারে ইস্তেখারা করা। দুই বেলা খাওয়ার ব্যাপারে ইস্তেখারা করা। চুরি করার ব্যাপারে ইস্তেখারা করা। বিকালঙ্গ নারীকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইস্তেখারা করা।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ২১৫।

ইস্তেখারার মূলকথা

ইস্তেখারার মূলতত্ত্ব হলো, ইস্তেখারা হলো ভালোকাজে সাহায্য চাওয়ার দোয়া। ইস্তেখারার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করে যেকাজই করে তাতে যেনো কল্যাণ হয়। আর যেকাজ আমার জন্য কল্যাণকর নয় তাতো করতেই দেবেন না। যখন ইস্তেখারা করা হলো তখন আর এটা ভাবার দরকার নেই যে, আমার অন্তরের ঝোঁক কোন দিকে। তার ওপরই আমল করবে। বরং অন্যকোনো লাভের কথা ভেবে যেকাজ অগ্রাধিকার দিয়েছিলে শেষ পর্যন্ত তার ওপর আমল করবে। এটাকেই ভালো মনে করবে। মূলকথা হলো, ইস্তেখারা মানে কল্যাণকামনা করা। কোনো সংবাদ সম্পর্কে জানা নয়।

[আনফাসে ইসা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৭৫]

ইস্তেখারা একধরনের দোয়া। তাহলো, হে আল্লাহ! এই কাজ যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে আমার অন্তরকে সেদিকে ফিরিয়ে দাও। নয়তো বিষয়টা আমার অন্তর থেকে সরিয়ে দাও এবং যা আমার জন্য ভালো হবে তা স্থির করে দাও!

এরপর যদি কাজটির প্রতি অন্তর ঝুঁকে তাহলে তা করাকে কল্যাণকর মনে করবে। চাই তা সফলতা আকারে আসুক, চাই ব্যর্থতার আকারে আসুক।

ব্যর্থতার সময় তার ফলাফলের মধ্যে কল্যাণ নিহিত থাকে। যেমন, পৃথিবীতে তার উত্তমপ্রতিদান পাওয়া গেলো অথবা পরকালে ধৈর্যের প্রতিদান বা সোয়াব পাওয়া গেলো। ইস্তেখারা না করলে সামগ্রিকভাবে এসব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। [মালফুজাতে আশরাফিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ২১৫]
ইস্তেখারার সারকথা হলো, ইস্তেখারার মাধ্যমে সর্বোত্তম কাজের সুযোগ হয়।

ইস্তেখারার দোয়ায় আছে, ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ অর্থাৎ কল্যাণকর কাজের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের প্রশান্তিও দান করুন! [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ২৩৪]

ইস্তেখারা কখন উপকারী

ইস্তেখারা এমন ব্যক্তির জন্য উপকারী যে চিন্তামুক্ত হবে। নয়তো মাথায় নানা চিন্তা থাকলে অন্তর সেদিকে ঝুঁকে যায়। সে মনে করে, ইস্তেখারা করে আমি এটাই জানতে পেরেছি। স্বপ্নে এবং কল্পনায় সে আগের জিনিস দেখতে পায়।
[ইফাজাতুল ইয়াওমিয়াঃ খণ্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ১২৫]

ইস্তেখারার উদ্দেশ্য

ইস্তেখারার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কাজের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ইস্তেখারা করার দ্বারা তার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে এবং জানা যাবে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। এরপর যেটা কল্যাণকর হবে সেটাই করবো। অনেক সময় আমরা দেখি, ইস্তেখারা করার পরও দ্বিধা দূর হয় না। তখন প্রশ্ন হয়, ইস্তেখারার বিধান দেয়া হয়েছে দ্বিধা দূর করার জন্য অথচ ইস্তেখারা করে তা দূর হলো না। তাহলে কেমন জানি আল্লাহর এই বিধানটি নিষ্ফল হয়ে গেলো। যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনর্থক বিষয়ের বিধান হতে পারে না তাই বুঝা গেলো ইস্তেখারার উদ্দেশ্য তার দ্বারা এমন কিছু জানা নয় যার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে এবং এই কাজের দুই দিকের একদিকের প্রাধান্য অবশ্যই অন্তরে পাবে। [ইফাজাতুল ইয়াওমিয়াঃ খণ্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ১২৮]

ইস্তেখারার উপকারিতা

ইস্তেখারার লাভ হলো অন্তরে এতোটুকু প্রশান্তিলাভ করা– আমাকে অবশ্যই কল্যাণ দান করা হবে। ইস্তেখারা করা আর না করার মধ্যে পার্থক্য হলো, যদি ইস্তেখারা করে সে প্রভাবিত হয় তাহলে তার অন্তরে এমন কিছু আসবে না যাতে অসর্তকতা ও ক্ষতি হতে পারে। আর ইস্তেখারা না করলে এমন কিছু অর্জন না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সামান্য চিন্তা করার কারণে তা ক্ষতিকর মনে হয়েছে কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করেনি। অসর্তকতাবশত ক্ষতিকর বিষয়টাই

বেছে নিয়েছে। যখন সে নিজের হাতে ক্ষতিকর বিষয় বেছে নেয় তাতে কল্যাণের কোনো অঙ্গীকার নেই। সুতরাং ইস্তেখারা সফলতার অঙ্গীকার নয় বরং কল্যাণের অঙ্গীকার। তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য।
[মালফুজাতে আশরাফিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ২১৫]

ইস্তেখারার সময়

অধম [সংকলক] প্রশ্ন করেছিলো, ইস্তেখারার জন্য রাত হওয়া আবশ্যক কী? থানবি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, এটা একটি ভিত্তিহীন প্রথা। ইস্তেখারার নামাজের পর না শোয়া আবশ্যক, না রাত হওয়ার প্রয়োজন আছে। যেকোনো সময়ে যেমন, জোহরের নামাজের সময় দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে সুন্নত দোয়া পাঠ করবে। এরপর অন্তরের প্রতি মনোযোগ দেবে। একদিনে যতোবার ইচ্ছা ইস্তেখারা করবে। [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ২৩৪]

ইস্তেখারা করার পদ্ধতি

একব্যক্তি ইস্তেখারা করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চায়। তখন তিনি বলেন, ইস্তেখারার দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে ইস্তেখারার দোয়া পড়বে। এরপর অন্তরের প্রতি মনোযোগ দেবে। মনোযোগ দিয়ে বসে থাকবে, শোয়ার প্রয়োজন নেই। ইস্তেখারার দোয়া একবার পড়াই যথেষ্ট। হাদিসশরিফে একবারই এসেছে। প্রথমে কোনো কাজের প্রতি মন ঝুঁকে তা মিটিয়ে ফেলবে। যখন নিজের মধ্যে একাগ্রতা আসবে তখন ইস্তেখারা করবে এবং এভাবে দোয়া করবে– "হে আল্লাহ! আমার জন্য যা কল্যাণকর তা-ই যেনো হয়।" মাতৃভাষায়ও দোয়া করা জায়েজ আছে। তবে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর শব্দে দোয়া করা উত্তম। [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ১৪৭]

ইস্তেখারার উপকার পেতে হলে

ইস্তেখারা এমন ব্যক্তির জন্য উপকারী যে চিন্তামুক্ত হবে। নয়তো মাথায় নানা চিন্তা থাকলে অন্তর সে দিকে ঝুঁকে যায়। সে মনে করে, ইস্তেখারা করে আমি এটাই জানতে পেরেছি। স্বপ্নে এবং কল্পনায় সে আগের জিনিস দেখতে পায়।
[ইফাজাতুল ইয়াওমিয়াঃ খণ্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ১২৫]

নির্ধারিত ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের দোয়া বা তাবিজ

ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, এমন তাবিজ দেয়া নাজায়েজ যার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর অনুগত হয়ে যায় বা বশে চলে আসে। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর জন্যই যখন এমন তাবিজ অবৈধ সুতরাং বিয়ের ব্যাপারে এমন তাবিজ করা হারাম। এমন

অবস্থায় বিয়েই বৈধ হবে না। কীভাবে এমন তাবিজ দেয়া বৈধ হতে পারে যার দ্বারা বিয়ে বৈধ এমন এক ব্যক্তিকে বশ করা হবে? কিন্তু অনেক বুজুর্গ এমন তাবিজ দিয়ে থাকেন। ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, যখন স্পষ্টভাবে এমন তাবিজ প্রদান করা হারাম তখন কোনো বুজুর্গ বা সুফির দ্বারা হলেও গোনাহ হবে। [আজলুল জামিয়াহ: পৃষ্ঠা: ৩৮২]

বিয়ের ব্যাপারে তাবিজ ও আমল করার শরয়িবিধান

প্রশ্ন : বিধবানারীকে বিশেষ আমল করে বিয়েতে রাজি করা জায়েজ আছে কি?
উত্তর : আমল তার ফলাফল হিসেবে দুই প্রকার। **এক.** এমন আমল যার ফলে যার উপর আমল করা হয়েছে সে অনুগত, বুদ্ধিহীন বাধ্য হয়ে যাবে। এ জাতীয় আমল এমন ক্ষেত্রে করা বৈধ নয় যা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়। যেমন, নির্ধারিত নারী বা পুরুষকে বিয়ে করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং নির্ধারিত নারী বা পুরুষকে বিয়ে করার জন্য তাবিজ করা বৈধ নয়।
দুই. এমন আমল যার ফলে সে বাধ্য হয়ে যায় না বরং সে দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্তর্দৃষ্টিতে নিজের জন্য উপকারী মনে করলে এমন আমল এমন কাজের জন্য করা জায়েজ আছে। এটা কোরআন ও শরিয়তের অন্যান্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

সহজে বিয়ে হওয়ার আমল

এশার নামাজের পর 'ইয়া লাতিফু' ও 'ইয়া ওয়াদুদু' এগারোশো এগারোবার পড়বে। শুরুতে এবং শেষে তিনবার করে দরুদশরিফ পড়বে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমল করতে হবে। আমল করার সময় তার কথা [যাকে ভালো লাগে] ভাবতে হবে। আল্লাহর কাছে দোয়াও করবে। ইনশাল্লাহ, উদ্দেশ্য পূরণ হবে। উদ্দেশ্য যদি আমল শেষ হওয়ার আগে পূরণ হয়ে যায় তাহলেও আমল ছাড়বে না। [বিয়াজে আশরাফি: পৃষ্ঠা: ২৩৯]

মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব আসার দোয়া

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقَىٰ - وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব বেশি আসার জন্য এই দোয়াটি হরিণের চামড়া বা কাগজে লিখে একটি পাত্রে ভরে রেখে দেবে। [আমলে কোরআনি: পৃষ্ঠা: ৬৪]

বিয়ে বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ

১. যদি প্রয়োজন থাকে এবং সামর্থও থাকে তাহলে বিয়ে করা উত্তম। আর যদি প্রয়োজন থাকে কিন্তু সামর্থ না থাকে তাহলে অধিক পরিমাণে রোজা রাখবে। এতে জৈবিকচাহিদা নষ্ট হয়ে যাবে।
২. বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রীর ধার্মিকতার প্রতি বেশি লক্ষ করবে। সম্পদ, সৌন্দর্য ও বংশীয় আভিজাত্যের পেছনে পড়বে না।
৩. যদি কোনো ব্যক্তি তোমার বোনের বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয় তাহলে বেশি খেয়াল করবে উত্তমস্বভাব, রীতি-নীতি ও ধার্মিকতার ওপর। সম্পদ, পদমর্যাদা ও বংশীয় আভিজাত্যের গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে শুধুই অমঙ্গল।
৪. যদি কেউ কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে থাকে তাহলে যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো উত্তর না পাবে অথবা নিজের থেকে সরে না যাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি বিয়ের প্রস্তাব দেবে না।
৫. যদি কেউ দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় তাহলে সে মহিলা বা তার পরিবারের জন্য আগের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্ত করা বৈধ নয়। বরং নিজের ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। হাদিসশরিফে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
৬. হিলা করার জন্য বিয়ে করা অত্যন্ত অমর্যাদাবোধের কথা। হাদিসশরিফে এমন লোকের ওপর আল্লাহর অভিশাপের কথা উল্লেখ আছে।
৭. বিয়ে মসজিদে হওয়া উত্তম। তাতে প্রচার বেশি হবে। স্থানটিও বরকতের।
৮. স্বামী-স্ত্রীর একান্ত আচরণ ও বিশেষ সম্পর্কের কথা বন্ধু-বান্ধব, সাথীবর্গ ও বান্ধবীদের সামনে বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের। অধিকাংশ মানুষ বিষয়টা খেয়াল করে না।
৯. ওলিমা [বিয়ের পর ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] করা মোস্তাহাব। কিন্তু বোঝা সৃষ্টি করা বা গর্ব-প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না।
১০. বিয়ের ব্যাপারে যদি কেউ তোমার সঙ্গে আলোচনা করে তাহলে কল্যাণকামিতার সঙ্গে পরামর্শ দেবে। যদি কোনো দোষ তোমার জানা থাকে তাহলে তা প্রকাশ করে দেবে। এমন পরনিন্দা হারাম নয়। কল্যাণকামিতার জন্য যদি দোষ বলার প্রয়োজন হয় তাহলে শরিয়তে তার অবকাশ আছে বরং কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ করা ওয়াজিব। [তালিমুদ্দিন : বিয়ে অধ্যায়]

প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সংশোধন

অধ্যায় ।৭।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিয়ের আগে কনে দেখে নেয়া উচিত

বর ও কনের পরস্পর বোঝা-পড়া এবং সুসম্পর্কের জন্য দেখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। বিয়ের সময় অবস্থা জানা ছাড়াও মেয়েকে একবার দেখে নেয়ার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই বরং দেখাই উচিত। কারণ, সম্পর্কটা হচ্ছে সারা জীবনের জন্য। হাদিসশরিফ কনে দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে দেখতে হবে জানার নিয়তে। উপভোগ বা স্বাদ নেয়ার নিয়তে নয়। যেমন ডাক্তার ও চিকিৎসকের জন্য রোগীর শরীরের তাপমাত্রা ইত্যাদি জানার নিয়তে দেখা জায়েজ। নয়তো স্বাদ নেয়ার জন্য দেখা জায়েজ নয়।

[ইফাজাতুল ইয়াওমিয়া: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৫৫]

যদি কোনো মহিলাকে বিয়ের ইচ্ছে করে এবং নিজেদের মনমতো হয় তবুও একবার দেখে নেবে। যাতে বিয়ের পরে তাকে দেখে বিতৃষ্ণা না আসে।

[তালিমুদ্দিন]

জরুরি সতর্কতা

হাদিসশরিফে ছেলেদের জন্য মেয়েদেখা প্রমাণিত। কিন্তু মেয়েদের দেখানো প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ হাদিসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, মেয়েপক্ষ নিজেদের থেকে ছেলেপক্ষকে মেয়ে দেখিয়ে দেবে। বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, ছেলেপক্ষের জন্য অনুমতি আছে যদি তোমাদের অনুকূল মনে হয় তাহলে তোমরা দেখে নেবে। হাদিসের উদ্দেশ্য কখনো এই নয় মেয়েপক্ষ নিজের থেকে ছেলেপক্ষকে মেয়ে দেখাবে। এ ব্যাপারে হাদিস চুপ রয়েছে।

[ইমদাদুল ফাতাওয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩০০]

নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব সম্পর্ক

কিছু মানুষকে দেখেছি তারা বাগদানকৃত মেয়ের সঙ্গে স্ত্রীসুলভ আচরণ করে। যা বিয়ের আগে করা হারাম। তারা মনে করে, যা কিছুদিন পরে হালাল বা বৈধ হবে তা এখন থেকে শুরু হলো। এটা শরিয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে অবৈধ হওয়া স্পষ্ট। কারো সন্দেহ হতে পারে, যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে আগে থেকে দেখা বৈধ। দেখা এক প্রকার উপভোগ বা স্বাদ নেয়া। আর সব উপভোগ সমান।

তার উত্তর তার প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে, প্রস্তাব পাঠানোর আগেও দেখা জায়েজ আছে। যার উদ্দেশ্য উপভোগ নয় বরং তার উদ্দেশ্য হলো অনুমান করা যে, আমি শুনে বা বুঝে যে ধরনের যতোটুকু সৌন্দর্য ও অন্যান্যগুণ বিয়ের পরে উপভোগ করতে চাই তা এই মেয়ের মধ্যে আছে কী-না। যদি না থাকে তবে তার সঙ্গে জীবনযাপন অসম্ভব হতে পারে। তাই শরিয়ত শুধু একবার চেহারা দেখার অনুমতি দিয়েছে। দেখার অনুমতি দিয়েছে প্রয়োজনে, তবে সে দৃষ্টি উপভোগের জন্য হবে না। সেখানে দ্বিতীয় দৃষ্টি যা অপ্রয়োজনীয়, এমনিভাবে স্পর্শ করা ও এমন অন্যান্য কাজকে তার ওপর কেয়াস বা তুলনা করা কীভাবে সম্ভব? [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৪]

অবিবাহিত নারী যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেছে তার কল্পনা করে স্বাদ নেয়া হারাম

যেমহিলার সঙ্গে বিয়ে হয়নি কিন্তু বিয়ে কল্পনা করে ভাবে– যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে তার সঙ্গে এভাবে সঙ্গলাভ করবো; বিয়ের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক এভাবে স্বাদ নেয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কারণ, যাকে কল্পনা করে স্বাদ নিচ্ছে সে এখনো হালাল হয়নি। শরিয়ত স্বাদ নেয়া হালাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন স্থান তথা অন্তরে কামনা বা আশা করাকে জিনা [অবৈধ যৌনাচার] বলেছে। স্তরগত দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও তা পাপের অন্তর্ভুক্ত।

যদি কোনো মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয়ে ছিলো কিন্তু তালাক বা অন্যকারণে বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, যদি সে জীবিত থাকে, চাই কারো সঙ্গে বিয়ে হোক বা না হোক–তাকে নিয়ে এভাবে কল্পনা করা– স্ত্রী থাকাকালীন তার সঙ্গে এভাবে মজা করতাম, এগুলো হারাম।

আর যদি মহিলা অন্যকারো সঙ্গে বিয়ে করে মারা যায় তাহলেও তার কল্পনা করে মজা নেয়া হারাম। কারণ, অন্যজনের সঙ্গে বিয়ে করার কারণে সে এমন সম্পর্কহীন হয়ে গেছে যেমন সে বিয়ের আগে ছিলো। আর যদি মহিলা তার বিবাহ-বন্ধনে থাকা অবস্থায় মারা যায় তাহলে আমার ধারণা অনুযায়ী বৈধতাই অগ্রাধিকার পায়। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৭০]

বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ের মতামত জানা আবশ্যক

একটি অপূর্ণতা হলো অধিকাংশ বর-কনের অনুমতি নেয়া হয় না। আশ্চর্য! বিয়ে যখন দু'জন মানুষের সারাজীবনের সম্পর্ক, যাদের মধ্যে হাজারো বিষয়ের লেনদেন হবে, তাদের যদি অন্যমত থাকে; তাদের জন্য অকল্যাণকর হয় বা

তারা অসন্তুষ্ট থাকে তবুও তাদের কাছে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় না। জোরপূর্বক বিয়ে দেয়া হয়। অনেকসময় মূল সময় পর্যন্ত বর-কনে উভয়ে বা তাদের একজন অস্বীকার করতে থাকে। কিন্তু জোরপূর্বক তাকে চুপ করানো হয়। সারাজীবনের জন্য তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। এটা কি বিবেক ও শাস্ত্রবিরোধী নয়? এতে কি অজস্র দুঃখ ও অকল্যাণ চোখে পড়ে না? কেমন অবিচার! কখনো কল্যাণের কথা চিন্তা করে তার মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। তাকে ধরে বেঁধে বিপদে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪]

বর-কনের অমতে বিয়ে দেয়ার বিধান

অনেক জায়গায় দেখা যায় অপছন্দ সত্ত্বেও বিয়ে দেয়ার ফলে স্বামী সারাজীবন আর স্ত্রীর খবর নেয়নি। বুঝালে স্পষ্ট উত্তর দেয়, আমি আমার মত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম। যারা এই সম্পর্ক করেছে এই দায়িত্ব তাদের।

এখন বলুন! এই সমস্যার সমাধান কী। মুরুব্বি বা অভিভাবকদের কল্যাণ হয়েছে আর অসহায় মজলুম নারী জেলে বন্দি হয়েছে। কোথায় সেই বিবেকক্ষয়প্রাপ্ত মানুষ। তারা এসে এই অত্যাচারিতাকে সাহায্য করুক। সাহায্য কি করবে সে হয়তো মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আর বেঁচে থাকলে এ কথা বলে এড়িয়ে যাবে। আমিতো কারো ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয়নি। এটা তার কপাল। হায় অভিশাপ! কী অভিশপ্ত উত্তর! শুনলে গায়ে আগুন ধরে যায়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪]

ইচ্ছে করে এমন যারা বলে তাদের গলা টিপে ধরি। তাদের ভাবটা হলো, আমাদের কোনো দোষ নেই। সব দোষ আল্লাহর!

[হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪]

বর-কনের মতামত নেয়ার পদ্ধতি

উত্তম পদ্ধতি হলো, যার সঙ্গে সে ফ্রি বা খোলা মনে কথা বলতে পারে যেমন, সমবয়স্ক বন্ধু বা বান্ধবী তাদের মাধ্যমে তার মনের কথা জেনে নেবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, এভাবে তাদের মতামত জানাটা সবচে নিরাপদ। কখনো জিজ্ঞেস করা ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে এমন আন্তরিক বন্ধুর কাছে নিজের পছন্দ ও অপছন্দের কথা জানিয়ে দেয়। অভিভাবকগণ পর্যন্ত তা জেনে যান। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪]

সবকিছু বর-কনের ওপর ছেড়ে দেয়াও চরম ভুল

বর-কনের মতামতের গুরুত্ব দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সবকিছু তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। এটা নিশ্চিত সব ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উত্তম মতামতের অধিকারী হয় না। তখন এসব অনভিজ্ঞদের মতামতই বা কী? আর তার ভরসাই বা কী!

অধিকাংশ সময় অভিভাবকগণ অভিজ্ঞতা ও ভালোবাসার আলোকে এমন সিদ্ধান্ত নেন যা কল্যাণকর। সুতরাং আমার মত এটা নয় এবং কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিও তা সমর্থন করবে না যে, ছেলে-মেয়ের মতামতের উপর সবকিছু ছেড়ে দেয়া হবে। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, ছেলে-মেয়ের অভিভাবক অভিজ্ঞতা ও ভালোবাসার আলোকে তাদের কল্যাণের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখবেন। এরপর সতর্কতাপূর্বক ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের সম্মতি ও সন্তুষ্টি অর্জন করবে। তার আগে বিশেষভাবে তাদের মতামত জানতে চাইবে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৩]

বড়োদের মতামত ছাড়া বিয়ে করার কুফল

আমি বড়োদের সম্মতিতে বিয়ের করার পর ঘরে বরকত দেখেছি। তা সে বিয়েতে দেখিনি যা স্বাধীনভাবে করা হয়েছে। খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে বিয়ের কথা বলা নির্লজ্জতার প্রমাণ।

إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

"যখন তোমার লজ্জা নেই তখন যা খুশি তা-ই করো।"

নির্লজ্জ মানুষের থেকে যে মন্দস্বভাব প্রকাশ পাবে অসম্ভব নয় জ্ঞানীব্যক্তি তা দেখেই এমন মহিলা থেকে বিরত থাকবে। বুঝতে পারবে, সে নির্লজ্জ মহিলা।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৪]

আমার মতে নারীর সবচেয়ে বড়ো অলঙ্কার লজ্জা ও সংকোচবোধ এবং তা সব কল্যাণের চাবিকাঠি। যখন লজ্জাই থাকলো না তখন ভালোরই বা কি আশা আর অমঙ্গলই বা কতোদূর। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৭১]

ছেলে-মেয়ের মধ্যে লজ্জা থাকা আবশ্যক

লাজ-শরম কম-বেশি ছেলেদের মধ্যেও থাকা আবশ্যক। বিশেষত ভারতবর্ষের জন্য আবশ্যক। কারণ এখানে অনেক ফেতনা ছড়িয়ে আছে। যার প্রতিরোধ লজ্জা দ্বারা সম্ভব। দিনে দিনে লজ্জা কমছে। আমরা শৈশবে ছেলেদের মধ্যে যে পরিমাণ লজ্জা দেখেছি এখনকার ছেলেদের মধ্যে তা দেখা যায় না। এখন

বৃদ্ধদের মধ্যে যতোটা দেখা যায় যুবকদের মধ্যে তা দেখা যায় না। লজ্জাহীনতার কারণে সমাজে মন্দের বিস্তার হচ্ছে। এজন্য কম-বেশি লজ্জা থাকা অনেক প্রয়োজন। তার প্রমাণ হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর আমল। তিনি এসে চুপ করে বসে থাকেন। লজ্জায় জিহ্বা নাড়াতে পারেন না। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছো।' [আজলুল জাহিলিয়্যাঃ পৃষ্ঠা: ২৬১]

গণমাধ্যমে বিয়ে

আজকাল একটি ঝড় শুরু হয়েছে। সংবাদের বিষয়ের মতো পাত্র-পাত্রীর বিবরণ সংবাদপত্রে ছাপানো হচ্ছে। কখনো পাত্র ঘোষণা করছে– আমাদের কাছে এই সম্পত্তি আছে, এই চাকরি করি, এই এই যোগ্যতা আছে; আমরা এমন একটি মেয়ে চাই। যাদের পছন্দ হয় আমাদের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করবে। এরপর একজন পাত্রী সংবাদপত্রের মাধ্যমে বা সরাসরি তার উত্তর লিখেন। নিজের সব গুণ এবং সুন্দর হওয়ার বিবরণ নিজের নির্লজ্জ কলমে লিখে। কিছু শর্তের কথাও জানায়। এভাবে পত্র লিখেই স্বাদ মিটে যায় কখনো আর মনমতো হয় না। কখনো বিয়ের আগে দুই-চারবার সাক্ষাৎ হয়। যাতে দেখা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পর বিয়ে হয়। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ কেমন অভিশাপ নেমে আসছে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৯]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুবক-যুবতীর ইচ্ছা

হজরত আবুসায়িদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেছেন, 'প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া দিয়ো না।' [হায়াতুল মুসলিমিন: পৃষ্ঠা: ১৯২]
যুবতীনারীর ইচ্ছা সে চাইলে বিয়ে করবে না চাইলে করবে না। যাকে খুশি বিয়ে করবে কেউ বাধ্য করবে না। যদি সে নিজে কারো সঙ্গে বিয়ে করে তাহলে বিয়ে বৈধ হয়ে যাবে। অভিভাবকগণ জানুক বা না জানুক। তারা সন্তুষ্ট থাকুক আর না থাকুক। সর্বাবস্থায় বিয়ে বৈধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সে যদি কুফু বা সমতা রক্ষা না করে, নিজের চেয়ে নিম্নশ্রেণীতে বিয়ে করে তাহলে ফতোয়া হলো, তার বিয়ে শুদ্ধ হবে না।
যদি বিয়ে কুফু বা সমতা রক্ষা করে কিন্তু তার মহর তার বংশের অন্যমেয়েদের মহর–যা শরিয়তের পরিভাষায় 'মহরেমিছিল' থেকে অনেক কম হয় তবুও বিয়ে বৈধ হয়ে যাবে। তবে অভিভাবকগণ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারবে। তারা মুসলিম বিচারকের কাছে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার আবেদন করবে।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২০০]

এমন অবস্থায় অভিভাবকগণ বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। তারা ইসলামিরাষ্ট্রের বিচারকের কাছে অভিযোগ করবে। তিনি তদন্ত করে বলবেন, আমি বিয়ে ভেঙ্গে দিলাম, তাহলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। শুধু বাবা যদি বলেন, আমি রাজি নই। তাহলে বিয়ে ভাঙ্গবে না। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৮০]
ছেলেদের বিধানও ঠিক এমন। যদি যুবক হয় তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া বিয়ে দেয় তাহলে তার অনুমতির ওপর মওকুফ বা স্থগিত থাকবে। যদি অনুমতি দেয় তাহলে বিয়ে বৈধ হবে নয়তো হবে না।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২০২]

ছেলে-মেয়ের সম্মতি ছাড়া বিয়ের বিধান

যদি ছেলে বা মেয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে তাদের কোনো ইচ্ছাধিকার নেই। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া তাদের বিয়ে বৈধ নয়। যদি সে অভিভাবকের

অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে ফেলে বা অন্য কেউ তাদের বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে সে বিয়ে অভিভাবকের অনুমতির ওপর স্থগিত থাকবে। যদি অনুমতি দেয় তাহলে বিয়ে বৈধ হবে নয়তো বিয়ে বৈধ হবে না। অভিভাবকের তার বিয়ে দেয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে তখন সে বিয়ে প্রতিহত করতে পারবে না।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২০২]

যদি মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং যেসময় তার বাবা তার কাছে অনুমতি চান অথবা বিয়ে হয়ে যাওয়ার সংবাদ তার কাছে পৌছে তখন সে বিয়ে অস্বীকার করলে বিয়ে হবে না। কারণ, অভিভাবকগণ জোর করার অধিকার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত সংরক্ষণ করেন। আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও বিয়ের অনুমতি চাওয়ার সময় বা বিয়ের সংবাদ পৌছার সময় যদি চুপ থাকে তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ের আগে বা বিয়ের পরের অস্বীকারের কোনো মূল্য নেই। যদি বাপের হয়ে অন্যকেউ অনুমতি চায় তাহলে শুধু চুপ থাকা সন্তুষ্টির প্রমাণ বলে গণ্য হবে না যতোক্ষণ না মুখে অনুমতি দেবে।
মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত হলো, স্বপ্নদোষ হওয়া, ঋতুস্রাব আসা, গর্ভবতী হওয়া। এসব চিহ্ন না পাওয়া গেলে পনেরো বছর বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ফতোয়া দেয়া হবে। যদি মেয়ে নিজে বলে আমি প্রাপ্তবয়স্ক এবং বাহ্যিক অবস্থা তাকে অস্বীকার না করে তাহলে তাকে সত্যায়ন করা হবে। শর্ত হলো, তার বয়স কমপক্ষে নয় হতে হবে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮৬]

অনুমতি নেয়ার পদ্ধতি এবং কিছু প্রয়োজনীয় মাসয়ালা

১. যদি মহিলা নিজে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে এবং ইশারা করে বলে, আমি তার বিয়ে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। সে যদি বলে আমি কবুল করলাম; তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। নাম নেয়ার দরকার নেই।
২. যদি উপস্থিত না থাকে তাহলে নাম উল্লেখ করতে হবে। তার পিতার নামও উল্লেখ করতে হবে। এতোটা উচ্চস্বরে নাম বলতে হবে যাতে সাক্ষী শুনতে পারে। যদি মানুষ তার পিতাকে না চেনে তাহলে তার দাদার নাম উল্লেখ করতে হবে। উদ্দেশ্য হলো, এমন ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে অমুকের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।
৩. যুবতী কুমারী মেয়েকে যদি বাবা বলেন, আমি তোমার বিয়ে অমুকের সঙ্গে দিচ্ছি এবং সে শোনার পর চুপ থাকে, মুচকি হেসে দেয় বা কান্না শুরু করে তাহলে তা অনুমতি বলে গণ্য হবে এবং বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। এমন নয় যে,

মুখে বললেই কেবল অনুমতি হবে। যারা জোরপূর্বক মুখে উচ্চারণ করান তারা ভালো করেন না।

৪. যদি অনুমতি চাওয়ার সময় নাম উল্লেখ না করে এবং সে তার নাম আগে থেকে না জানে তাহলে চুপ থাকা সন্তুষ্টি হবে না। তা অনুমতি মনে করা যাবে না বরং নাম ও তার অবস্থা জানানো আবশ্যক। যাতে মেয়ে বুঝতে পারে সে অমুক। এমনিভাবে যদি মহর উল্লেখ না করে এবং 'মহরেমিছিল' থেকে অনেক কম মহর ধরা হয় তাহলে মেয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হবে না। এজন্য নিয়মমাফিক আবার অনুমতি নিতে হবে।

৫. বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য এটাও একটি শর্ত যে, কমপক্ষে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দু'জন মহিলা উপস্থিত থাকতে হবে। তারা নিজ কানে বিয়ে এবং ছেলে-মেয়ের সম্মতিবাক্য শুনলেই তবে বিয়ে হবে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪]

অভিভাবক কাকে বলে

ছেলে ও মেয়েকে বিয়ে দেয়ার অধিকার যাদের থাকে তাদেরকে অভিভাবক বলা হয়। ছেলে ও মেয়ের অভিভাবক প্রথমে পিতা। সে না থাকলে দাদা। দাদা না থাকলে পরদাদা। যদি তারা না থাকেন তাহলে সহোদর ভাই। সে না থাকলে সৎভাই [বাপ-শরিক], তারপর ভাতিজা, তারপর ভাতিজার ছেলে, এরপর তার ছেলে, এরপর সৎচাচা, তারপর তার ছেলে এবং অধস্তন পুরুষ। তাদের কেউ না থাকলে বাবার চাচা এবং তার অধস্তন পুরুষ। তাদের কেউ না থাকলে দাদার চাচা এবং তাদের অধস্তন পুরুষ প্রমুখ।

ওপর্যুক্ত কেউ না থাকলে মা অভিভাবক হবেন, এরপর দাদী এবং নানী, এরপর নানা, এরপর সহোদর বোন, এরপর সৎবোন [বাপ-শরিক], এরপর ফুফু, এরপর মামা, এরপর খালা প্রমুখ।

অপ্রাপ্তবয়স্কব্যক্তি কারো অভিভাবক হতে পারে না। পাগল কারো অভিভাবক হতে পারে না। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২০০]

মেয়েদের নিজে বিয়ে করার কুফল

কোনো সন্দেহ নেই প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান মেয়ে যদি নিজের বিয়ের কথাবার্তা নিজে বলে এবং প্রস্তাব দেয় ও গ্রহণ করে তাহলে তার বিয়ে হয়ে যাবে। তবে দেখার বিষয় হলো, বিনা প্রয়োজনে এবং শরয়ি কোনো কল্যাণ ছাড়া এমন করাটা কেমন। এটা না শরিয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় না বিবেকের দৃষ্টিতে। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেন-

لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ

"কুফু বা সমতা ছাড়া মেয়েদের বিয়ে দিয়ো না এবং অভিভাবক ছাড়া কেউ তাকে বিয়ে দেবে না।" [দারাকুতনি, বায়হাকি]

এই হাদিসতো আমল করার জন্য। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মেয়ের বিয়ের জন্য অভিভাবককে মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন। যদিও আমরা তাকে বিয়ের বৈধতার জন্য শর্ত মনে করি না!

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের ব্যাপারে স্বচ্ছতা এবং সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে

যেহেতু বিয়ে মানুষের পরস্পরের মধ্যে একটি লেনদেন তাই বর-কনেকে অত্যন্ত সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করা আবশ্যক। যাতে কোনো ঝামেলার সুযোগ না থাকে। নিজের চিন্তা যতোটুকু পৌঁছে সে অনুযায়ী প্রত্যেক কথা পরিষ্কার করে দেবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৫০]

প্রতারণা করে অপছন্দের বা অকর্মণ্য মেয়েকে বিয়ে দেয়া

একটা ভুল হলো, কখনো মেয়ে এমন হয় যে ছেলে তাকে পছন্দ করবে না। কিন্তু মেয়ের অভিভাবকগণ প্রতারণা করে কারো সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলো। যেমন, কারো এমন রোগ আছে যা সহবাসে অন্তরায়।

একজায়গায় পাগলের বিয়ে এক অন্ধের সঙ্গে দেয় যে স্বামীকে আহত করে। সে ভেগে যায় এবং সীমাহীন কলঙ্ক হয়। শেষ পর্যন্ত তালাক হয়ে যায়। মহর নিয়ে বিবাদ হয়।

একজায়গায় একমহিলা সম্পূর্ণ বুড়ি ছিলো। চামড়া শ্বেতরোগীদের মতো সাদা ছিলো। পুরুষ যদি শত ধৈর্যধারণ করে, কৃতজ্ঞ হয় বা কোনো চাহিদা না থাকে তবুও তার পুরোটাজীবন পানশে হয়ে যায়। এর থেকে মুক্তি সম্ভব কিন্তু মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। কিছু মানুষ একে ব্যক্তিত্বহীনতা মনে করে। কিছু মানুষের সামর্থ কম তাদের পক্ষে এসবের গুরুত্ব দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যারা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে তারা ধোঁকা এবং কষ্ট দেয়ার অভিশাপ-গোনাহ অবশ্যই কামাবে। অনেক সময় দেখা যায়, দুরাচারী মহিলাকে কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে যখন এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন তারা ধৈর্যের কথা বলে। কিন্তু তারা কখনোই স্বামী হিসেবে এমন মেয়েদেরকে মেনে নেয় না। বরং তাদের জন্য দিনমজুর স্বামী খোঁজে। মুখরা ও উগ্রস্বভাবের স্ত্রী ভদ্রস্বভাবের স্বামীদের জন্য সাক্ষাৎনরক। এমনিভাবে সে অন্ধ হলে, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলে, পেটের পীড়া থাকলে তা গোপন করা উচিত নয়। এসব দোষ গোপন করার ফলাফল সবসময় মন্দই হয়।

যদি স্বামী নিরীহপ্রকৃতির হয় তাহলে তার জীবনটা নষ্ট হয়। আর তার ধৈর্য না থাকলে সে স্ত্রীকে কষ্ট দিতে শুরু করে। স্ত্রী আগ থেকে রোগাক্রান্ত বা সমস্যাগ্রস্থ ছিলো। এখন তার মাত্রা আরো বেড়ে গেলো। উভয়ের মতভিন্নতা বাড়তে বাড়তে তাদের বংশের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। একসময় শত্রুতা তৈরি হয়। একে অপরের নামে মামলা করে। কখনো বিচ্ছেদের চেষ্টা হয়। স্বামী অস্বীকার করে। কখনো মহর দাবি করা হয়। কখনো মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে মহর মাফ দেখানো হয়। কখনো ক্ষমা করে দেয়ার পরও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে আদায় করে নেয়া হয়। মোটকথা হাজারো সমস্যা ও সংকট তৈরি হয়। যেসবের মূলে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর অমিল। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৬২]

নপুংসক ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া

কিছুমানুষ একটি ভুল করে। তারা খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া এবং নিজেরা বেকার হওয়ার পরও বংশীয় রীতি অনুযায়ী কোনো যুবতীকে বিয়ে করে। আবার নিজের অক্ষমতা হওয়াটাও মেয়ে এবং মেয়ের অভিভাবকদের থেকে গোপন করে। এমন মানুষ অন্যকে বিপদে ফেলে দেয়।

মহিলা যদি চরিত্রবান হয়ে থাকে তাহলে সারা জীবনের জন্য কঠিন জেলে বন্দি হয়ে গেলো। আর যদি চরিত্রহীন হয় তাহলে সে পাপে জড়াবে। দুই অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হবে। যা একই সঙ্গে কষ্টদায়ক এবং বিবাদের কারণ। দ্বিতীয়ত উভয়ের জন্য সম্মানহানী এবং উভয়ের বংশের জন্য বদনাম। কিছু মানুষ এমন অবিচার করে– এমন একটি ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার পরও অর্থ ও খ্যাতির লোভে আবার এমন মানুষের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেয়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৪]

বিয়ের ঘোষণা সঙ্গে সঙ্গে হওয়া উচিত

কিছুমানুষ নিজের প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে গোপনে বিয়ে করে। গোপনে বিয়ে করার প্রথম মন্দদিক হলো এটা সরাসরি হাদিসলঙ্ঘন। হাদিসে এসেছে–

أَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ

"সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের ঘোষণা দাও এবং তা মসজিদে করো।"

যেসব ইমামের মতে ঘোষণা করা বিয়ের শর্ত তাদের কাছে ঘোষণা ছাড়া বিয়েই বৈধ হবে না।

হানাফিমাজহাবে যদিও বিয়ে সঠিক হয়ে যাবে, যখন তার প্রয়োজনীয় সাক্ষী তথা দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা উপস্থিত থাকবে কিন্তু

ইমামদের মতভিন্নতার কারণে বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া এমনটি করা অপছন্দনীয়।

গোপনে বিয়ে করার ক্ষতি

১. যদি গোপনে বিয়ে করার প্রথা চালু হয়ে যায় তাহলে অনেক নারী-পুরুষ গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এরপর মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়ে বা ধরা পড়ে যায় তাহলে তারা খুব সহজে বিয়ের দাবি করে বসবে।

২. সাধারণ মানুষ নিজেরা জানে না বিয়ে সঠিক হওয়ার জন্য সাক্ষীর সর্বনিম্নস্তর বা সংখ্যা কতো। তারা যখন কোনো গোপন বিয়ের সংবাদ শুনবে যার সাক্ষীর সংখ্যা জানা যায় না। তখন অসম্ভব নয় তারা বিশ্বাস করে বসবে বিয়ের জন্য সাক্ষী প্রয়োজন নেই। তারা সুযোগ পেলেই এমন করে বসবে। ফলে বিশ্বাসগত ও কর্মগতভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৫২]

৩. গোপন বিয়ের প্রচলন হলে এমন মহিলার উপর জবরদস্তি হবে যাকে কেউ বিয়ে করার ইচ্ছা রাখে কিন্তু সে রাজি নয়। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেক সময় পুরুষলোকটি দু'জন মৃতমানুষের নাম উল্লেখ করে বিয়ের দাবি করতে পারে। বলবে, তাদের সামনে গোপনে বিয়ে হয়েছিলো। দাবির পর দু'-চারজন সহযোগীর সহায়তায় তার ওপর বাড়াবাড়ি করতে পারে। সাধারণ মানুষ এই সন্দেহে কিছু বলবে না যে, বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার অধিকার রয়েছে, আমরা কেনো বিবাদে যাবো?

৪. বিবাহিত মহিলার ব্যাপারে এই দাবি হতে পারে, দ্বিতীয় একজনের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিয়ের আগেই আমাদের সন্তানের সঙ্গে তার গোপনে বিয়ে হয়েছিলো। কেননা আজকাল এমন ঘটনা ঘটে।

সন্দেহ নেই, এসব বিশৃংখলা থেকে বাঁচতে ইসলামিশরিয়ত বিয়ের ঘোষণা দিতে বলেছে। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৫৪]

প্রয়োজনে গোপনে বিয়ে করা

অনেক সময় শরিয়তসমর্থিত অপারগতার কারণে গোপনে বিয়ে করার প্রয়োজন হয়। যেমন, একজন বিধবানারীর অন্যত্র বিয়ে করার প্রয়োজন। এখন ঘোষণা করলে নিজের মূর্খআত্মীয়-স্বজন কর্তৃক বিপদের সম্ভাবনা আছে। অন্যত্র যাওয়ার জন্য যাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ নয় এমন কোনো আত্মীয় নেই। এজন্য সে গোপনে প্রথমে বিয়ে করবে। এরপর স্বামীর সঙ্গে অন্যত্র চলে যাবে। [ইসলাহে ইনকিলাব; পৃষ্ঠা: ৫৫]

ছেলেপক্ষ প্রস্তাব দেবে না মেয়েপক্ষ

সাহাবায়েকেরামের মধ্যে কখনো পিতা নিজে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। হজরত হাফসা [রদিয়াল্লাহু আনহা] যখন প্রথম স্বামী থেকে বিধবা হয়ে যান তখন হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] হজরত ওসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বলেন, 'হাফসা বিনতে ওমর বিধবা হয়ে গেছে তাকে আপনি বিয়ে করে নিন! সেখানে ভারতবর্ষের রীতি ছিলো না যে, পিতা নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেয়াকে হারাম মনে করবে। হজরত ওসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] বললেন, 'আমি বুঝে উত্তর দেবো।'

তিনি অপারগতা জানালেন। এরপর হজরত আবুবকর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বলা হলো, হাফসা বিনতে ওমর বিধবা হয়েছে তাকে আপনি বিয়ে করে নিন। তিনিও বললেন, আমি ভেবে-চিন্তে উত্তর দেবো। তিনি কিছু বললেন না।

এরপর রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রস্তাব আসলো এবং বিয়ে দেয়া হলো। এরপর হজরত আবুবকর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর পক্ষ থেকে উত্তর এলো। তিনি বললেন, 'আমার উত্তর না দেয়াতে আপনি মনে কষ্ট পেয়েছেন। ভাই! আমি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে হাফসা [রদিয়াল্লাহু আনহা] সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছিলাম। এজন্য উত্তরপ্রদানে চুপ ছিলাম। না পারছিলাম নিজেগ্রহণ করতে না পারছিলাম রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর রহস্য প্রকাশ করতে। স্পষ্ট উত্তর প্রদানে আশংকা ছিলো আপনি যদি আবার গ্রহণ না করেন।' আরবের মানুষ এতো অকৃত্রিম ও ভণিতাহীন ছিলো। পিতা মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিতে লজ্জাবোধ করতো না। বরং মহিলারা এসে আগ্রহ প্রকাশ করতো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে বিয়ে করে নিন!

একবার হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর মেয়ে লজ্জাশীরতা সম্পর্কে বলেন, হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] তাকে বলেছেন, 'তোমার জন্য উত্তম ছিলো তুমি নিজেকে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্য উৎসর্গ করে দেবে।' এটা আরবে দোষের বিষয় ছিলো না।

আমার উদ্দেশ্য এই নয়, এমনটি করা আবশ্যক বরং কেউ এমন করলে দোষের কিছু নয়। [আজলুল জাহিলিয়্যাহ:পৃষ্ঠা: ২৬১]

বিয়ে কোন বয়সে করা উচিত

অধ্যায় ।৮।

মেয়েদের বিলম্বে বিয়ের ক্ষতি

কিছু অপরিণামদর্শী মানুষ কুমারী মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও কয়েক বছর বসিয়ে রাখে। শুধু আভিজাত্যের খোঁজে তাদের বিয়ে দেয় না। কখনো কখনো ত্রিশ বছর পর্যন্ত আবার কারো চল্লিশ বছর বয়স পার হয়ে যায়। অন্ধ অভিভাবকদের চিন্তায় আসে না তাদের কী পরিণাম হবে। হাদিসে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি এসেছে, এমন অবস্থায় যদি মেয়ের কোনো পদস্খলন হয় তাহলে পিতার উপর সম-পরিমাণ গোনাহ বর্তাবে বা পিতার মতো তার কর্তৃত্বের অধিকারী অভিভাবকের ওপর বর্তাবে। যেমন, ভাই।

কারো যদি হাদিসের হুঁশিয়ারিতে ভয় না হয় তাহলে দুনিয়ার মান-সম্মানের ভয় তো দুনিয়াদারও করে। তখন ভয় থাকে কখন গর্ভবতী হয়ে যায়। কখন কার সঙ্গে পালিয়ে যায়।

যদি কোনো অভিজাত ভদ্রপরিবারে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবুও সেসব মেয়েরা মনে মনে অভিভাবকদের অভিশাপ করতে থাকে। কারণ তারা একধরনের অত্যাচারিত। আর অত্যাচারিতের অভিশাপ বিফলে যায় না।

যৌতুক ও অলঙ্কারের জন্য বিলম্ব

অধিকাংশ সময় দেখা যায়, যে জিনিসের অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করে তা ভাগ্যে জোটে না। অর্থাৎ যৌতুক ও অলঙ্কার। অহংকারের জন্য এই সম্পদও লাভ হয় না। বাধ্য হয়ে হঠাৎ সাদাসিধে বিয়ে করে ফেলে। পরে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে দেরি করলে বদনাম বাড়ে– এতোদিন অপেক্ষা করলে, তা ছাই পেলে না লাকড়ি? দেয়ার যদি এতোই ইচ্ছা থাকে তাহলে বিয়ের পর দিতে কে নিষেধ করেছে? [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০-৩৭]

নানা আয়োজনের জন্য বিলম্ব করা

যদি ব্যাপক মেহমানদারির ইচ্ছা থাকে তাহলে মেহমানদারি করার অনেক উপলক্ষ প্রত্যেক সময় পাওয়া যায়। এটা কি এমন ফরজ কাজ যে সব ইচ্ছা এই অভাগার ওপর চর্চা করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ অবিচার। নিন্দনীয় কাজ। হাদিসশরিফে এসেছে, যদি তোমাদের কাছে এমন কোনো প্রস্তাব আসে যার

চরিত্র ও ধার্মিকতা তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। নয়তো পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়বে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০-৩৭]

উপযুক্ত পরিবার না পাওয়ার অনর্থক আপত্তি

কিছুমানুষ আপত্তি করে, কোনো উপযুক্ত পরিবার থেকে প্রস্তাব আসছে না। কার হাত ধরে তুলে দেবো? এই আপত্তি যদি বাস্তবিক হতো তাহলে ঠিক ছিলো। অর্থাৎ যদি সত্যিকার অর্থে উপযুক্ত পরিবার না পাওয়া যায় তাহলে লোকটি বাস্তবেই অপারগ ছিলো। কিন্তু এই আপত্তিতেই আপত্তি আছে। যতো প্রস্তাব আসে সবই কি অযোগ্য? অযোগ্য হওয়ার একটি ধারণা তারা মাথায় লিপিবদ্ধ করে রাখে। যার ধরনটা নিম্নরূপ–

১. বংশগতভাবে হজরত হোসাইন [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর মতো।

২. স্বভাব-চরিত্রে হজরত জোনায়েদ বাগদাদি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতো।

৩. জ্ঞানে যদি ধর্মীয় হয় তাহলে হজরত আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতো। আর জাগতিক হলে ইবনেসিনার মতো।

৪. সৌন্দর্যে হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-এর মতো।

৫. সম্পদ ও নেতৃত্বে কারুন ও ফেরাউনের মতো।

বাড়াবাড়ি সব কাজে নিন্দনীয়। একব্যক্তির মধ্যে সবগুণ একত্রিত হওয়া বিরল ও দুষ্প্রাপ্য।

যে গুণগুলো যে পরিমাণ তুমি অন্যের মাঝে খুঁজছো, তোমাকে কন্যা দান করেছিলেন যিনি, যার বদৌলতে তুমি আজ মেয়ের বাবা হয়ে বাহাদুরি দেখাচ্ছো; সে কি তোমার ব্যাপারে এতোটা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছিলেন? যদি এমনটি করতো তাহলে তোমার ভাগ্যে কোনো মেয়ে জুটতো না। তারা এমনটি করেনি। আর তারা যখন এমন করেনি তখন তুমি কিংবা তোমার পিতা অন্যমুসলিম ভাইয়ের ব্যাপারে অনীহা দেখাও। তোমার মধ্যে সব গুণাগুণ পুরোপুরি না থাকার পরও বিয়ে করে তুমি তাদের মেয়েকে হাতে তুলে নিয়েছো। যা নিজের জন্য পছন্দ করো তা অন্যের জন্য কেনো পছন্দ করো না? দ্বিতীয়ত যখন তুমি নিজের জন্য এতো গুণের স্বামী খোঁজো; ইনসাফের সঙ্গে বলো! তোমার ছেলের জন্য যখন মেয়ে খোঁজো বা ইচ্ছা করো তখন কি নিজের ছেলের মধ্যে এতো গুণ খুঁজে পাও, না পেতে চাও?

তৃতীয়ত তুমি যেমন অন্যের মধ্যে অসংখ্য ভালো গুণ খুঁজে পেতে চাও তার দশভাগের একভাগ যদি কেউ তোমার কাছে কামনা করে তাহলে নিশ্চিত তুমি সারাজীবনে একটি মেয়েও বিয়ে দিতে পারবে না।

সারকথা, উপযুক্ত পরিবারের প্রস্তাব আসছে না– আপত্তিটা অধিকাংশ সময় অবাস্তব হয়ে থাকে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০-৩১]

মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র কম পাওয়ার কারণ

আলোচনা ছিলো মেয়েদের জন্য ভালোপাত্র কম পাওয়া যায়। আমি একবার আমার বংশের মেয়েদের সামনে একথা বলেছিলাম। কারণ, মেয়েদের মাঝে কেবল নারীত্ব দেখা হয়। যার কারণে মনে হয়, ছেলের জন্য মেয়ে যথেষ্ট। আর ছেলেদের মধ্যে হাজারো বিষয় দেখা হয়। সে সুদর্শন হবে, স্বচ্ছলতা থাকবে। শিক্ষিতও হবে, আত্মসম্মানবোধ ও কাজকর্ম থাকতে হবে। আমি বলি, এতো শর্ত যা তোমরা ছেলেদের ব্যাপারে করো যদি মেয়েদের ব্যাপারে করা হয় তাহলে ইনশাল্লাহ! বিয়ের উপযুক্ত একটি মেয়েও বের হবে না। কেননা অধিকাংশ মেয়ে অকর্মণ্য ও অযোগ্য। অর্থাৎ ছেলেরাও অধিকাংশ অযোগ্য এবং মেয়েরাও অধিকাংশ অযোগ্য।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৩৮৩; হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৩০]

অল্পবয়সে বিয়ে করলে সবলব্যক্তি দুর্বল হয়

এখন যারা সবল তারাও অনেক দুর্বল। এর মূল কারণ মনে হয় এখন খুব অল্পবয়সে বিয়ে করে। অঙ্গসমূহ পুরোপুরি বৃদ্ধি বা শক্ত হতে পারে না। এতো অল্পবয়সে বিয়ের কারণ হয়তো মনের শখ যে, ছোটো ছোটো বর-কনে দেখবে। আবার কোথাও এই ধারণা করে, এমনটি না করলে মারা যাবে। কোথাও বাবা-মায়ের উৎসাহ থাকে না বরং বাচ্চাই পেট থেকে বের হয়ে পাগল হয়ে যায় বিয়ের জন্য। ফলে বাবা-মা তাদের বিয়ে দিতে অপারগ হয়ে যায়।

যা হোক, অল্পবয়সে বিয়ে হয় ফলে বাবা-মা হয় দেখতে ছোটো ছোটো। তাদের বাচ্চাও হয় ছোটো ছোটো। যদি এমনটি হতে থাকে তাহলে যে কথার প্রচলন আছে– কেয়ামতের আগে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সমান মানুষে পৃথিবী আবাদ হবে–অল্পদিনে সত্য হয়ে যাবে।

অতীতকালে মানুষ অনেক শক্তিশালী ছিলো। কারণ তারা বিয়ে করতো শরীর পুরোপুরি বৃদ্ধি বা শরীরের গঠন পূর্ণ হওয়ার পর। অর্থাৎ যখন তাদের দেহে পূর্ণ যৌবন এবং গঠন পূর্ণতা লাভ করতো। এজন্য তারা দীর্ঘজীবনলাভ করতো।

[রুহুস সিয়াম মুলহাকাতে বারাকাতে রমজান: পৃষ্ঠা: ১৬৯]

অল্পবয়সে বিয়ে করার ক্ষতি

অনেক মানুষ এবং অনেক বংশে একটি ভুল করে তারা খুব অল্পবয়সে বিয়ে করিয়ে দেয়। যখন বর-কনে বলতেও পারে না বিয়ে কাকে বলে এবং বিয়ের কী কী অধিকার বা কর্তব্য আছে। অল্পবয়সে বিয়ে দেয়ার অনেক ক্ষতি আছে। অনেক সময় ছেলে অযোগ্য হয় তখন মেয়ে বড়ো হয়ে বা তার অভিভাবকগণের পছন্দ হয় না। এখন চিন্তা করে পৃথক করে দেবে। কেউ মাসয়ালা জানতে চায় আবার কেউ মাসয়ালা না জেনে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়। ছেলের থাকে চরম গোঁড়ামি। সে না তার অধিকার আদায় করে না তাকে তালাক দেয়। এক উদ্ধাররহিত বিপদে তারা পড়ে যায়।

অনেক সময় অল্পবয়সে বিয়ে হওয়ার পর এমন হয়েছে, মেয়েকে ছেলের পছন্দ হয় না। সে তখন অন্যত্র পাত্রী অনুসন্ধান করে। সে না তার খবর রাখে না তাকে তালাক দেয়। অপারগতা পেশ করে– জানা নেই আমার বিয়ে কবে হয়েছে? যারা বিয়ে করিয়েছে দায়িত্ব তাদের। তালাক দেয়া সামাজিকভাবে লজ্জার মনে করে।

অনেক সময় শিশুকালে তারা একসঙ্গে খেলাধুলা করে, ঝগড়া করে। যার ফলে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ তৈরি হয়। আর যেহেতু প্রথম থেকে একসঙ্গে আছে তাই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশেষ কোনো আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নতুন স্ত্রীলাভ করলে যেমনটা হয়। অল্পবয়সে বিয়ের ফলাফল সার্বিকভাবে মন্দই মন্দ। এসব ক্ষতি ও অমঙ্গল থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৩-৪৪]

ছাত্রজীবনে বিয়ে করা উচিত নয়

একব্যক্তি নিজের ছেলের বিয়ের ব্যাপারে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর সঙ্গে পরামর্শ করে। ছেলে পড়ালেখায় ব্যস্ত ছিলো। লোকটি এটাও বলেছিলো, উত্তমপ্রস্তাব এসেছে। হজরত বলেন, আমাদের মাজহাব হলো, যদি মুসলমান হয় তাহলে ঠিকই আছে। ছেলেরও একজন স্ত্রী চাই। কিন্তু এখন তার পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যাবে। [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪০৪]

অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে করা উচিত নয়

আল্লাহতায়ালা বলেন–

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

"তোমরা এতিমদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে।"

এই আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, বিয়ের জন্য উপযুক্ত সময় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরবর্তী সময়। সহজপথ হলো, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এবং উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করার পর বিয়ে করবে। যাতে যার বিয়ে সে যেনো বুঝতে পারে।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৫ ও ৪৪]

কতো বছর বয়সে ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়

মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কোনো বয়স নেই। তবে তারা নয় বছরের আগে প্রাপ্তবয়স্ক হয় না এবং পনেরো বছরের পর অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে না। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ন্যূনতম বয়স নয় বছর। যখন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যাবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ হলো ঋতুস্রাব ইত্যাদি। সর্বোচ্চসীমা পনেরো বছর। এরপর লক্ষণ না পাওয়া গেলেও প্রাপ্তবয়স্ক বলে ফতোয়া দেয়া হবে। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২১৮]

প্রয়োজনে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে করা

যদি বর-কনে অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং ভালোপ্রস্তাব ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে অল্পবয়সে বিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু যদি তেমন কোনো প্রয়োজন না থাকে, নিছক প্রথাগত কারণে হয় তাহলে এমন প্রথা মিটিয়ে ফেলার যোগ্য। হ্যাঁ, তবে বিয়ে সঠিক হয়ে যাবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৫]

অল্পবয়সে বিয়ে বৈধ হওয়ার প্রমাণ

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে অপ্রাপ্তবয়সে হয়েছিলো। মুসলিমশরিফে হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] নিজে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে বিয়ে করেছিলেন যখন তাঁর বয়স ছিলো সাত বছর। বাসর হয়েছিলো নয় বছর বয়সে। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ইন্তেকাল হয় যখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৬৭]

বর্তমানে দ্রুত বিয়ে দেয়া উচিত

বর্তমান সময়ে দ্রুত বিয়ে দেয়া উচিত। কারণ, এখন আর আগের যুগের মতো মানুষের মধ্যে পবিত্রতা ও ধর্মপরায়ণতা নেই। এখন বেশি ধরে থাকার সাহস হয় না। কিন্তু দ্রুত বিয়েতে যেমন উপকার আছে তেমন কিছু অপকারও আছে।

[আজলুল জাহিলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৬৯]

দ্রুত বিয়ের বিধান

প্রসিদ্ধহাদিস–

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًّا

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, “হে আলি! তিনটি কাজে বিলম্ব করবে না। নামাজ যখন তার সময় হয়ে যায়। জানাজার নামাজ যখন লাশ উপস্থিত হয়। উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে যখন উপযুক্ত ঘর পাওয়া যায়।” [তিরমিজি]

এ হাদিসে দ্রুত বিয়ে করার আবশ্যিকতাকে নামাজের সমপর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৬৮]

ছেলে-মেয়ের বিয়ে কোন বয়সে দেয়া উচিত

আল্লাহতায়ালা বলেন–

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“তোমরা এতিমদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে।”

ওপর্যুক্ত আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে বিয়ের উপযুক্ত সময় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর। সহজপথ হলো, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এবং উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করার পর বিয়ে করবে। তার আগে নয়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪]

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ের সময় তার বয়স ছিলো সাড়ে পনেরো বছর। হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বয়স ছিলো একুশ বছর।

[ইসলাহে রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯০]

খুবঅল্পবয়সে বিয়ে দিলে অনেক ক্ষতি আছে। উত্তম হলো, ছেলে যখন উপার্জন করতে পারবে এবং যখন সংসার পরিচালনার দায়িত্বপালনে সক্ষম হবে তখন বিয়ে দেয়া। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৬৩]

বাবা-মায়ের দায়িত্ব

হজরত আবুসায়িদ ও আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, ‘যার সন্তান হবে তার দায়িত্ব হলো নাম রাখা এবং উত্তমশিক্ষায় শিক্ষিত করা। যখন সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন তাদের

বিয়ে দেয়া। যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাকে বিয়ে না দেয় এবং সে কোনো পাপে লিপ্ত হয় তাহলে তার গোনাহ কেবল বাবা-মায়ের উপর বর্তাবে [কারণ হওয়ার জন্য]। হ্যাঁ, মূল গোনাহ তারও হবে।

হজরত ওমর ও আনাস ইবনে মালেক [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, ‘তাওরাতে লেখা আছে, যখন মেয়ের বয়স বারো হয় [এবং বিভিন্ন লক্ষণে বিয়ের প্রয়োজন বুঝে আসে] তখন যদি তাকে বিয়ে না দেয় এবং মেয়ে কোনো পাপে লিপ্ত হয় তাহলে তার গোনাহ পিতার ওপর বর্তাবে।’ [ইমদাদুল ফতোয়া: পৃষ্ঠা: ২৬৪]

দুই ছেলে বা দুই মেয়ের বিয়ে একসঙ্গে দেয়া উচিত নয়

নিজের দুই ছেলের বিয়ে বা দুই মেয়ের বিয়ে যথাসম্ভব একসঙ্গে দেবে না। কেননা স্ত্রীদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য হবে। স্বামীদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য হবে। স্বয়ং ছেলে-মেয়ের চেহারা-গঠন, পোশাক-আশাকের স্টাইল, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, লাজ-শরম ইত্যাদিতে অবশ্যই পার্থক্য হবে। এছাড়া আরো অনেক বিষয় মুখে মুখে পার্থক্য হয়ে যায়। কোনোটা বাড়ানোর দ্বারা কোনোটা কমানোর দ্বারা। এতে চান না চান দ্বিতীয়জনের মন খারাপ হয়ে যাবেই।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৯]

অধ্যায় । ৯ ।

বাগদান ও তারিখ নির্ধারণ
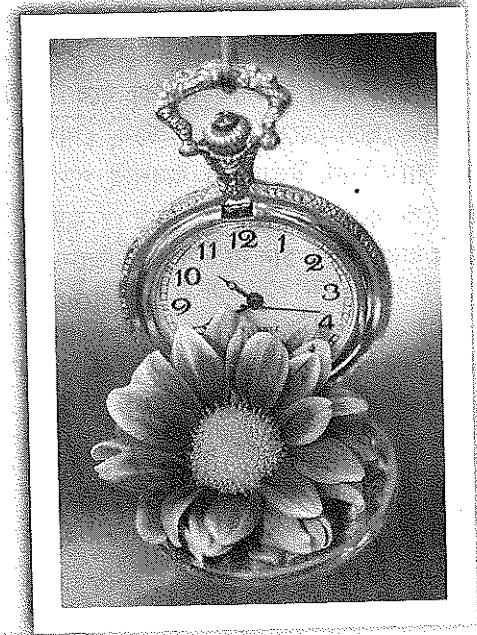
প্রথম পরিচ্ছেদ

বাগদানের মূলকথা

প্রকৃতপক্ষে বাগদান হচ্ছে একটি মৌখিক অঙ্গীকার। এর সঙ্গে মিষ্টি-মিঠাই ইত্যাদির কী প্রয়োজন? যদি পত্রযোগে এই অঙ্গীকার করা হয় তাহলেই যথেষ্ট। এর বাইরে অতিরিক্ত যে আনুষ্ঠানিকতা করা হবে তা বাহুল্য ও অনর্থক হবে।

[হুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৫১]

আজকাল বাগদানে যেসব হুল্লোড় হয় তা বাহুল্য ও সুন্নতবিরোধী। মৌখিক প্রস্তাব ও উত্তরই যথেষ্ট। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯০]

বাগদান উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতির শরয়িবিধান

আজকাল বাগদান অনুষ্ঠানে পুরুষ আত্মীয়দের উপস্থিতি আবশ্যক হয়ে গেছে। বর্ষা বা অন্যকিছু হোক চিঠির ওপর ক্ষান্ত করা সম্ভব নয়। পাঠক! যে জিনিস শরিয়ত আবশ্যক করেনি তাকে শরিয়ত আবশ্যক করেছে এমন জিনিসের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়– ইনসাফের সঙ্গে বলুন, এতে শরিয়তের বিরোধিতা হয় কী-না? আর যখন তা শরিয়তবিরোধী হলো তা পরিহার করা আবশ্যক কী-না?

যদি বলা হয়, পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়। তাহলে তা ভুল। তারা নিজেরাই জিজ্ঞেস করে, তারিখ কী লেখা হবে? যা বিশেষ পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। সেটা বলা হয় এবং লেখা হয়। অধিকাংশ মানুষ নিজে আসতে পারে না। তাদের ছোটো ছোটো সন্তানদের পাঠায়। তারা পরামর্শে কি মতামত দেবে? কোনো মতামত দেয় না। মনগড়া কথা, সহজ কথা কেনো বলো না– এমনটি কুসংস্কার হয়ে আসছে। এমন প্রথা বিবেক ও শরিয়তের আলোকে নিন্দনীয়। পরিহার করা আবশ্যক। কেননা এই প্রথার কিছু বিষয় শরিয়তবিরোধী। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৩]

যদি পরামর্শ করতে হয় তাহলে অন্যান্য কাজে যেভাবে পরামর্শ করা হয় সেভাবে করবে। এক-দুইজন বুদ্ধিমান কল্যাণকামী ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নিলেই যথেষ্ট। মানুষের ঘরে ঘরে করাঘাত করার কী দরকার।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৩]

বাগদান দ্বারা কথা চূড়ান্ত হয় না

মানুষ বলে বাগদান দ্বারা বিয়ে চূড়ান্ত হয়ে যায়। আমি অনেক দুর্বলবিষয় জোড়া লাগতে এবং অনেক দৃঢ়বিষয় ভেঙ্গে যেতে নিজ চোখে দেখেছি। একারণে আমি বলি, এটা ইবলিসিধারণা যে, সমস্ত বিষয় মজবুত হয়ে যায়। এটা পুরনো বিষয় যে, বাগদান দ্বারা বিয়ের অঙ্গীকার দৃঢ় হয়।

আমি বলি, অঙ্গীকার ঠিক আছে তার এককথাই যথেষ্ট। যার অঙ্গীকার ঠিক নেই সে বাগদান করেও তার বিপরীত করে। কেউ কি কামান নিয়ে বসে আছে? অনেক জায়গায় দেখা যায়, অন্যকোনো লাভ দেখে বা লোভে পড়ে বাগদান ভেঙ্গে দেয়। তখন সেই দৃঢ় অঙ্গীকার কী কাজে আসে এবং যা কিছু খরচ করলো তা-ও বা কী উপকার করে? সুতরাং ওপর্যুক্ত ধারণা ঠিক নয়, ধোঁকামাত্র।

বাগদানে দৃঢ়তা আসলেও আমাদের তা-ই করা উচিত যা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] করেছেন। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৬২ ও ৪৫১]

বাগদান প্রথা : রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর দৃষ্টান্ত

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে কোনোধরনের প্রথা ও কুসংস্কার ছাড়াই দিয়েছেন। তখন এসব প্রথাও ছিলো না। পরবর্তী লোকেরা তা সৃষ্টি করেছে।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে দিয়েছেন, সেখানে না ছিলো বাগদান, না ছিলো মেহেদি, না ছিলো তার কোনো স্মারক। বিয়ের বাগদান ছিলো, হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর বৈঠকে এসে চুপ করে বসে ছিলেন। লজ্জায় কথা বলতে পারছিলেন না। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি, তুমি ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছো। জিবরাইল [আলায়হিস সালাম] বলে গেছেন।'

আল্লাহর হুকুম হলো, ফাতেমার বিয়ে আলির সঙ্গে দেয়া হবে। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] রাজি হলেন, ব্যস, বাগদান হয়ে গেলো। সেখানে মিষ্টিমুখ হয়নি। কোনো বৈঠকও হয়নি যে লাল সূতা দিয়ে সাজানো হবে, কোনো কাপড় হবে, মিষ্টি বিতরণ হবে। [হুকুকুল জাওজাইন]

বাগদানের জন্য আগত মানুষের আতিথেয়তার বিধান

প্রশ্ন : যেসব লোক দূর-দূরান্ত থেকে মেয়ের বাগদানের জন্য আসে, এক-আধবার তাদেরকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দিলে পরস্পর সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে এমন আশায় তাদের মেহমানদারি করলে কোনো সমস্যা আছে কী?

উত্তর : ওপর্যুক্ত নিয়তে [মেহমানদারি করা] বাগদানের পূর্বাপর সব অবস্থায় ঠিক আছে। [ইমদাদুল ফতোয়া; খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪০৪]

ঘটকালি করে টাকা নেয়ার বিধান

প্রশ্ন : সম্পর্ক করিয়ে টাকা নেয়া বা প্রথম থেকে কোনো কিছু নির্ধারণ করে রাখা যেমন, নির্ধারিত পরিমাণ নগদ টাকা, একজোড়া লুঙ্গি ইত্যাদি বিনিময় করার শরয়ি বিধান কী? সমস্যা আছে কি নেই?

উত্তর : যদি চেষ্টার উপায় না থাকে বা তা সহজসাধ্য না হয় এবং চেষ্টায় কোনো প্রতারণা না থাকে তাহলে উক্ত পারিশ্রমিক যাতায়াত খরচ হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ হবে। নয়তো বৈধ হবে না।

وَإِلَّا فَلَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَلَا عَلَى الْخِدَاعِ

"শুধু সুপারিশ করে এবং ধোঁকা দিয়ে কোনো বিনিময়গ্রহণ করা বৈধ নয়।"

ইসলামিশরিয়তের দৃষ্টিতে সুপারিশ করা কোনো মূল্যমান কাজ বা বস্তু নয়। এর বিনিময়গ্রহণ করা নাজায়েজ।

لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ تَقَوُّمُهُ وَأَيْضًا فَلَا تَعَبَ فِي الشَّفَاعَةِ وَلَا يُعْطَوْنَ الْأَجْرَ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَمَلٌ فِيْهِ مَشَقَّةٌ بَلْ مِنْ أَنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ بِالْوَجَاهَةِ وَالْوَجَاهَةُ وَصْفٌ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فَجَعَلُوْا أَخْذَ الْأَجْرِ عَلَيْهَا رِشْوَةً وَسُحْتًا وَاللهُ أَعْلَمُ

"কেননা সুপারিশ মূল্যমান হওয়া শরিয়ত কর্তৃক বর্ণিত নয়। সুতরাং তার মূল্য ওয়াজিব হবে না। কষ্টসাধ্য কাজ হিসেবে তার কোনো বিনিময় দেয়া হবে না। বরং সুপারিশ হলো ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে কাউকে প্রভাবিত করা। ব্যক্তিত্ব কোনো মূল্যমান গুণ নয়। ফলে তার বিনিময়গ্রহণ করাকে ফিকাহবিদগণ ঘুষ ও অবৈধ আখ্যায়িত করেছেন।" [ইমদাদুল ফাতাওয়া: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৩২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা

আমরা বিয়ের উপলক্ষকে উৎসবের উপাদান মনে করি। বিয়ের জন্য ভালোদিন খুঁজি। পঞ্জিকা থেকে শুভক্ষণ তালাশ করি। পাগলামির সময় মনে থাকে না এটা জায়েজ না-কি নাজায়েজ।

জ্যোতিষ ও পণ্ডিতদেরকে জিজ্ঞেস করে বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়। যেনো অপবিত্র সময়ে বিয়ে না হয়। খবরও নেই অলক্ষুণে মুহূর্ত কোনটি। প্রকৃত অলক্ষুণে মুহূর্ত সেটিই যখন আল্লাহ থেকে মানুষ বিমুখ থাকে। যখন তুমি নামাজ ছেড়ে দেবে তার থেকে বেশি অপবিত্র সময় কোনটি হতে পারে? আর যে কারণে নামাজ ছেড়ে দিলে তার চেয়ে বেশি কলুষিত কাজ কী হতে পারে?

কিছু মানুষ কিছু তারিখ ও মাস যথা মহররম মাসকে এবং কিছু বছর যেমন আঠারো বছরকে অমঙ্গলকর মনে করে। সেসব মাসে বিয়ে করে না। এমন বিশ্বাস ও যুক্তিও শরিয়তে অগ্রাহ্য। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৪]

মূলত এটা জ্যোতিষবিদ্যার অন্তর্গত। আর জ্যোতিষবিদ্যা ইসলামিশরিয়তে নিন্দিত। সম্পূর্ণভ্রান্ত। নক্ষত্রের মাঝে মঙ্গল-অমঙ্গল থাকা অগ্রহণযোগ্য। যদিও জ্যোতিষবিদদের কিছু কথা বাস্তব হয়ে যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতার দাবি হলো, তাদের কথা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অবাস্তব ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

তাছাড়াও তাতে অনেক ভ্রান্তি ও অকল্যাণ রয়েছে। ভ্রান্তবিশ্বাস, প্রকাশ্য শিরক, আল্লাহর ওপর আস্থাহীনতা ইত্যাদি।

[বয়ানুল কোরআন: সুরা: সফফা, পৃষ্ঠা: ১৩০]

জিলকদ মাসকে অমঙ্গল মনে করা কঠিন ভুল

বিয়ের তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মানুষ জিলকদ মাসকে বিয়ের জন্য অকল্যাণকর মনে করে। এটা অত্যন্ত কঠিন কথা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের শামিল। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] চারটি উমরা করেছেন, সবগুলো জিলকদ মাসে। শুধু যে ওমরা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বিদায় হজের সঙ্গে করেন তা জিলহজ মাসে ছিলো। এর দ্বারা কতোটা বরকত প্রমাণিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়াসাল্লাম] তিনটি ওমরা করেছেন জিলকদ মাসে। তাছাড়া জিলকদ মাস হজের মাসের অন্যতম। হজের মাসগুলো রহমত ও বরকতের মাস।

[আহকামে হজ মোলহাকায়ে সুন্নাতে ইবরাহিম: পৃষ্ঠা: ৪৮৩]

জিলকদ, মহররম ও সফর মাসে বিয়ে করা

মূর্খমহিলারা জিলকদ মাসকে 'খালি চান্দ' বা বরকতশূন্য মাস মনে করে। তাতে বিয়ে করাকে অমঙ্গল মনে করে। এমন বিশ্বাস করা গোনাহ। এমন বিশ্বাস থেকে তওবা করা উচিত। অনেক জায়গায় সফর মাসের তেরো তারিখকে অকল্যাণকর মনে করে। এমনসব বিশ্বাস শরিয়তবিরোধী। এর থেকে তওবা করা উচিত। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৯]

মহররম মাসে বিয়ে-শাদি

মহররম মাস বিপদের সময় হিসেবে বিখ্যাত। কারণ, সাইয়েদুনা হোসাইন [রদিয়াল্লাহু আনহু] এর শাহাদৎবরণের ঘটনা। যা একটি আকস্মিক দুঃখজনক দুর্ঘটনা। কিন্তু আমরা মূর্খতাবশত সীমালঙ্ঘন করি। যার কারণে মানুষ মহররম মাসে বিয়ে করাকে অপছন্দ ও মাকরুহ মনে করে।

আমার একআত্মীয়ের বিয়ে জিলকদ মাসের ত্রিশ তারিখে ঠিক করা হয়। যাতে মহররম মাসে বাসর রাত হওয়া নিশ্চিত ছিলো। তবে এই সম্ভাবনা ছিলো যে, কোথাও তা মহররমের এক তারিখ হবে। এতে মেয়ে অভিভাবক অনেক অসন্তুষ্ট হন। বিয়ের তারিখের জন্য এতো ভালোদিন ছিলো! তবু সে এতোটুকু দয়া করেছিলো যে, নিজে বিয়েতে উপস্থিত না হলেও বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলো। নিজের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের থেকে মামাকে পাঠিয়েছিলো। আমি বললাম, এই বিশ্বাস ভাঙ্গা উচিত। এই দিন বিয়ে করেছে কিন্তু কয়েক বছর মেয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যেনো অনভিপ্রেত কোনো বিষয় না ঘটে। যদি মেয়ের সামান্য কানও গরম হয় তাহলে অভিভাবক বলবে অমুক দিনে বিয়ে করার কুফল। কিন্তু আল্লাহর রহমত কোনো অপ্রীতিকর বিষয় হয়নি। স্বামী-স্ত্রী দুইজনই খুব সুখে-শান্তিতে আছে। তাদের সন্তানও হয়েছে। আল্লাহ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সময় সম্পর্কে মানুষের ধারণা ভুল। কোরআন-হাদিসে বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট আছে, মঙ্গল-অমঙ্গল কোনো সময় ইত্যাদির কারণে নয়। কোনোদিনও অকল্যাণকর নয়। কোনো মাসও অকল্যাণকর নয়। কোনো স্থানও অকল্যাণকর নয়। এমন কি কোনো মানুষও হতভাগা নয়। মূলত অকল্যাণ হলো পাপ ও পাপাচের লিপ্ত হওয়া।

[হাকিকাতুস সবর মুলহাকায়ে ফাজায়েলে সবর ও শুকর, আততাবলিগ: খণ্ড: ১২]

কোনোদিন অকল্যাণকর নয়

কিছুশিক্ষিত মানুষ দিনের মধ্যে অকল্যাণ থাকার ব্যাপারে কোরআনের এই আয়াত প্রমাণ হিসেবে পেশ করে–

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ

"আমি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু অভিশপ্ত দিনগুলোতে।"
এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেদিনগুলোতে আদজাতির ওপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিলো তা অভিশপ্ত ছিলো। কিন্তু বলি সেদিন কোন কোন দিন ছিলো? এটা দ্বিতীয় আয়াত থেকে জানা যাবে। বর্ণিত হচ্ছে–

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ - سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا-

"আর আদজাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো প্রচণ্ড একঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন অবিরাম সাত রাত ও সাত দিন।'

[সুরা: হাক্কা, আয়াত: ৬-৭]

তাদের ওপর আটদিন পর্যন্ত শাস্তি অবতীর্ণ হয়। এই হিসেবে কোনোদিনই বরকতপূর্ণ নয়। বরং প্রত্যেকদিন অভিশপ্ত। কেননা সপ্তাহের প্রতিদিন তারা শাস্তি পেয়েছিলো। যাকে কোরআনে অভিশপ্ত দিনসমূহ বলা হয়েছে। কেউ কি একথা দাবি করবে? এখন আয়াতের সঠিক অর্থ জেনে নিন। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, যেদিনগুলোতে তাদের ওপর শাস্তি এসেছিলো সেদিনগুলো শাস্তি আসার কারণে বিশেষভাবে অভিশপ্ত ছিলো। সবদিন নয়। সেশাস্তির কারণ ছিলো গোনাহ। সুতরাং অভিশাপের মূল ভিত্তি হলো গোনাহ। এখন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সন্দেহ থাকলো না।

[তাফসিলুত তওবা, দাওয়াতে আবদিয়্যা: খণ্ড: ৪১, পৃষ্ঠা: ৪১]

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় বিয়ে

এককথা প্রচলিত আছে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় অলক্ষী হয়। এই সময় যথাসম্ভব বিয়ে-শাদি না করা উচিত। হায়দারাবাদে আমার ভাতিজি বিয়ে দিতে যাই। যেদিন বিয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয় ওইদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়। তখন সেখানের মানুষ ব্যাকুল হয়ে পড়ে– এমন সময় কী বিয়ে হবে? যদি এমন সময় বিয়ে হয় তাহলে সাড়া জীবন অকল্যাণের প্রভাব থেকে যাবে। অনেক আধুনিক শিক্ষিত মানুষও সন্দেহে পড়ে যায়। অবশেষে একত্রে আমার কাছে এলো।

বললো, কিছু বলতে চাই। আমি বললাম, বলুন। তারা জিজ্ঞেস করলো, চন্দ্রগ্রহণের সময় বিয়ে হবে?
আমি বললাম, এমন সময় বিয়ে করা অনেক উত্তম। আমার কাছে এর প্রমাণ আছে। আপনারা জানেন আমরা ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর অনুসারী। আর এটাও জানেন চন্দ্রগ্রহণের সময় আল্লাহর জিকির ও নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকা চাই। ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, বিয়েতে লিপ্ত হওয়া নফল ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়। সুতরাং এমন সময় বিয়েতে লিপ্ত হওয়া অনেক উত্তম। তারা সবাই বিষয়টি মেনে নেয়।
আমি তাদেরকে বলে দেই কিন্তু তাদের ধারণার কারণে আমার মন সংকীর্ণ হয়ে থাকে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ! চাঁদ তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যাক। যদি এমন সময় বিয়ে হয় এবং এরপর কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তারা বলার সুযোগ পাবে এমন সময় বিয়ে করার কারণে এমনটি হলো। আল্লাহর কুদরত! অল্প সময়ের মধ্যে চাঁদ পরিষ্কার হয়ে গেলো। সবাই খুশি হলো। বিয়ে হয়ে গেলো। [আততাহজিব; ফাজায়েলে সওম ও সালাত: পৃষ্ঠা: ৫৫২]

বিয়ে পড়ানো ও অন্যান্য আয়োজন
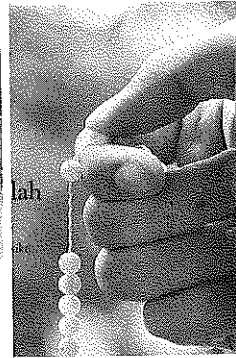
অধ্যায় । ১০ ।

বিয়ের মজলিস ও বিশেষ জমায়েত

যখন হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে সম্পন্ন হয় তখন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "আনাস! যাও আবুবকর, ওমর, ওসমান, জোবায়ের এবং আনসারদের একটি দলকে ডাকো।"

এর দ্বারা বোঝা যায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে নিজের বিশেষজনদের ডাকাতে কোনো সমস্যা নেই। তার লাভ বা রহস্য হলো, বিয়ের প্রচার ও ঘোষণা হবে। যা কাম্য। কিন্তু এই জমায়েতে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কোনো কৃত্রিমতা ছাড়া সময়ে দু'-চারজন নিকটাত্মীয়কে একত্রিত করা হবে। এটাই যথেষ্ট।

একটি ঘটনা

আমার একবন্ধু তার মেয়ের অনুষ্ঠান করছিলো। মাশাল্লাহ! তিনি সবকিছু অত্যন্ত ধার্মিকতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে করেন। সাহস করে সবপ্রথা পরিহার করেন। কোনো কিছু ভ্রুক্ষেপ করেন না। তিনি আমার কাছে আসেন এবং আমাকে বিয়ে পড়ানোর জন্য বাড়ি নিতে চান। আমি কিছু আপত্তি করি। তিনি সফর অবস্থায় কাজ সমাধা করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় এই বৈঠকে বিয়ে সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে দুইটি কল্যাণ।

এক. তার ঘর সুন্নতের বরকতে ভরে উঠবে এবং

দুই. একথা জানা যাবে যে, বিয়ে এখানেও হতে পারে। হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় বিয়ে অত্যন্ত সাদা-সিধে বিষয়। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৪৭]

বিয়ে কে পড়াবে

১. হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়েতে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] একটি দীর্ঘ খুতবা পাঠ করে প্রস্তাব ও সম্মতিপ্রদান করেন। এর দ্বারা জানা যায়, পিতার গোপনে গোপনে বা অপরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পড়া সুন্নতবিরোধী। বরং উত্তম হলো, পিতা নিজেই মেয়ের বিয়ে পড়াবে। কেননা তিনি অভিভাবক। অন্য যে পড়াবে সে উকিল বা প্রতিনিধি। আর অভিভাবক ও উকিলের মাঝে অভিভাবক প্রধান্য পায়। এটাই রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সুন্নত। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯১]

২. এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, যিনি বিয়ে পড়াবেন তিনি আলেম হবেন। বা কোনো আলেমের কাছে থেকে ভালোভাবে জেনে নিয়ে বিয়ে পড়াবেন।

অধিকাংশ সময় কাজিগণ বিয়ে ও তার আনুষঙ্গিক মাসয়ালা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন। কিছুক্ষেত্রে নিশ্চিত, বিয়েই শুদ্ধ হয় না। সারাজীবন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। কিছু ক্ষেত্রে লোভে পড়ে যায়। লোভে পড়ে যেমন বলে তেমনভাবে বিয়ে পড়িয়ে দেয়। বিয়ে হোক বা না হোক। [ইসলাহুর রুসুম; পৃষ্ঠা: ৬৭]

বিয়ে পড়ানোর জন্য লোক ঠিক করার মাসয়ালা

অন্যান্য খরচের মতো যেমন, বাচ্চার শিক্ষা, শিল্প ও পেশার মতো যার মনে চাইবে যাকে ইচ্ছা ডাকবে। কাউকে নির্দিষ্ট করবে না। যার ওপর উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট থাকবে। কোনো কাজি নিজেকে প্রকৃত দাবিদার ভাববে না। কেউ এমনটি ভাববে না, এটা কাজি সাহেবের অধিকার। ঘটনাক্রমে কেউ যদি কাজ করতে থাকে তাহলে তাকে কষ্টে দেয়া যাবে না। শহরে যতোজনের খুশি বিয়ে পড়াবে। সবাই স্বাধীন। যে খুশি সে দেবে। কাউকে নির্দিষ্ট করবে না। কেউ যদি যোগ্য না হয় তাহলে এই কাজ করা তার জন্য বৈধ হবে না। তাকে সমস্যার কারণে বাধা দেয়া হবে।

এমনিভাবে যে বিয়ে পড়ানোর জন্য ডাকবে সে পারিশ্রমিক দেবে। বরকে নির্দিষ্ট করবে না। দিলে অবশ্য বৈধ হবে। উদ্দেশ্য হলো, অন্যান্য কাজে ডাকা আর বিয়ের জন্য ডাকার মাঝে পার্থক্য নেই।

[ইমাদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৭৪]

বিয়ে পড়িয়ে টাকা নেয়ার অবৈধ অবস্থাসমূহ

১. যদি ছেলেপক্ষ টাকা দেয় এবং মেয়েপক্ষ কাজি ডাকে, যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে- তাহলে টাকা নেয়া সম্পূর্ণ অবৈধ হবে। যে ডাকবে তার ওপর পারিশ্রমিক দেয়া ওয়াজিব। অন্যের ওপর চাপানো না জায়েজ।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭৮]

২. অধিকাংশ সময় কাজি নিজের প্রতিনিধি পাঠান। যার সামান্য অংশ থাকে। বেশির ভাগ পায় কাজি। কাজির এই অর্থ দাবির কোনো দলিল নেই। এটার জন্য চেষ্টা- দাবি করা নাজায়েজ। যদি বিয়ের লোকেরা খুশি হয়ে কিছু দেয় তাহলে নেয়া জায়েজ। নয়তো যাকে দেয়া হয়েছে সে-ই তার মালিক হবে। তবে প্রতিনিধি যদি খুশি হয়ে দেয় তাহলে পুরোটা নিতে পারবে। কিন্তু কাজি শুধু এই জন্য দেয় যে, আমি তোমাকে নিয়োগ দিয়েছি। এভাবে নেয়া ঘুষ ও হারাম। ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহিতা অর্থাৎ কাজি ও তার প্রতিনিধি উভয়ে গোনাহগার।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬৮]

৩. যদি অন্যকেউ বিয়ে পড়ায় তাহলে কাজি বা তার প্রতিনিধির জন্য অর্থগ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। কাজি দিয়ে বিয়ে পড়ানো ওয়াজিব নয়।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭৮]

যখন মেয়েপক্ষ কাজি ডাকে তখন ছেলেপক্ষের কাছ থেকে বিয়ে পড়ানোর মজুরি দেয়া বা নেয়া হারাম। [হুসনুল আজিজ]

যখন কাজিকে ছেলেপক্ষ ডাকে, চাই নিজের লোকদের মাধ্যমে হোক বা মেয়েপক্ষের লোকদের মাধ্যমে ডাকা হোক। তখন তাদের প্রদেয় পারিশ্রমিক কাজির নেয়া জায়েজ আছে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৮১]

বিয়ে পড়ানোর পারিশ্রমিক যা সবসময় ছেলেপক্ষ দেয়–তারা কাজিকে ডাকুক বা না ডাকুক তা ঘুষের শামিল। বিয়ে পড়ানোর পারিশ্রমিক দেয়া মূলত জায়েজ। কিন্তু কথা হলো, কে দেবে? শরিয়তের দৃষ্টিতে পারিশ্রমিক সে-ই দেবে যে কাজিকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে। আর এটা সাধারণত মেয়েপক্ষই হয়। [আততাহজিব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৩]

বিয়ে পড়ানোর জন্য যা যা জানা আবশ্যক

এখন বিয়েসংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় মাসয়ালা উল্লেখ করছি। যা সবার বিশেষ করে বিয়ে পড়ানো কাজিদের জানা থাকা আবশ্যক। এসব মাসয়ালা না জানার কারণে অধিকাংশ সময় বিয়েতে অকল্যাণ হয়।

১. অভিভাবক প্রথমে বাবা, তারপর দাদা তারপর আপন ভাই, তারপর বৈমাত্রীয় ভাই, তারপর মহিলার সন্তানগণ। এই ধারাবাহিকতায় তাদের চাচা, তারপর বৈমাত্রীয় চাচা, তারপর চাচাতো ভাই। এই ধারাবাহিকতা এবং মিরাসলাভের ক্ষেত্রে আসাবাদের [যারা কোরআনে বর্ণিত ওয়ারিশদের পর অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করে] ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হবে। যখন কোনো 'আসাবা' থাকবে না তখন মা, এরপর দাদী, তারপর ফুফু, তারপর নিজের বোন, তারপর বৈপিত্রীয় বোন ও ভাই, তাদের পর মামা, তারপর খালা, তারপর চাচাতো বোন, এরপর চতুর্থ স্তরের ওয়ারিশগণ।

২. নিকটাত্মীয় থাকতে দূরের আত্মীয় বিয়ে দিতে পারে না।

৩. অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। মেয়ে নিজেও বলার অধিকার রাখে না। চাই তার প্রথম বিয়ে হোক বা দ্বিতীয় বিয়ে হোক।

৪. অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে যদি অভিভাবক অনুপোযুক্ত স্থানে দেয় তখন অভিভাবক পিতা বা দাদা হলে এবং তারা কোনো কল্যাণের কথা চিন্তা করে

দিলে শুদ্ধ হয়ে যাবে। শর্ত হলো, অন্যকোনো বিষয় কল্যাণকর বলে প্রকাশ পেতে পারবে না। নয়তো বিয়ে শুদ্ধ হবে না। পিতা-দাদা ছাড়া অন্যকেউ হলে ফতোয়া হলো, বিয়ে সম্পূর্ণ নাজায়েজ হবে।

৫. প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া শুদ্ধ হবে না। যদি তার দ্বিতীয় বিয়ে হয় তাহলে মুখে অনুমতি নিতে হবে। আর প্রথম বিয়ে হলে এবং অভিভাবক অনুমতি নিলে তার চুপ হয়ে যাওয়াটাই অনুমতি। অন্যকেউ নিলে মুখে বলা আবশ্যক। মুখে বলা ছাড়া অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬. প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যদি অভিভাবকের অনুমতি কুফু বা সমতার মধ্যে নিজে নিজে বিয়ে করে তাহলে জায়েজ। যদি সমতা ছাড়া করে তবে ফতোয়া হলো, বিয়ে সম্পূর্ণ নাজায়েজ। যদি কোনো মেয়ের অভিভাবক না থাকে অথবা অভিভাবক থাকে তবে সে কুফু ছাড়া বিয়েতে সম্মত হয় তাহলে বিয়ে বৈধ।

৭. অভিভাবক যদি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া দেয় এবং সে তা শুনে চুপ থাকে তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি অভিভাবক ছাড়া অন্যকেউ প্রাথমিক অনুমতি নিয়ে ছিলো কিন্তু সে চুপ ছিলো তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কিন্তু স্বামীকে সঙ্গ দেয়ার সময় সে যদি অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৮. প্রস্তাব ও কবুল তথা গ্রহণের শব্দাবলি এতোটা উঁচুআওয়াজে বলবে যাতে সাক্ষী তা ভালোভাবে শুনতে পারে।

৯. বিয়ের আগে এটাও খোঁজ নেয়া আবশ্যক যে, ছেলে-মেয়ের মধ্যে এমন কোনো বংশীয় বা দুধের সম্পর্ক আছে কী-না যার দ্বারা বিয়ে হারাম হয়ে যায়। বংশ বা দুধের সম্পর্কে এমন কেউ না হয় যার সঙ্গে বিয়ে হারাম।

[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬২]

বরকে মাজারে নিয়ে যাওয়া

বর সেই শহরের কোনো বরকতপূর্ণ মাজারে গিয়ে নগদ কিছু উৎসর্গ করে। এখানে যে বিশ্বাস কাজ করে তা নিশ্চিত শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যদি কোনো জ্ঞানীব্যক্তি এমন ভ্রান্তবিশ্বাস থেকে মুক্ত হন তারপরও যেহেতু এর দ্বারা ভ্রান্তবিশ্বাস মানুষের মধ্যে দৃঢ় ও প্রসারিত হয় এজন্য সবার উচিত এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬২]

টৌপর পড়ার বিধান

একজন হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-কে জিজ্ঞেস করেন, টৌপর পড়ার বিধান কী? তিনি উত্তর দেন, জায়েজ নেই। এর দ্বারা হিন্দুদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়। এটা তাদের রীতি। [মোলাকাতে হেকমতঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৪]

টৌপর পড়া শরিয়তবিরোধী কাজ। কারণ তা কাফেরদের রীতি। হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে, যেব্যক্তি যেসম্প্রদায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬২]

বিয়ের সময় কালেমা পড়ানো

একব্যক্তি প্রশ্ন করেন, বিয়ের সময় কালেমা পড়ানোর যে প্রচলন আছে তার বিধান কী? তিনি বলেন, আমি এর কোনো প্রমাণ পাইনি। তবে একজন মৌলভি সাহেব বলেছেন, আমি 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে দেখেছি, যদি থেকে থাকে তাহলে তা মোস্তাহাব পর্যায়ের কাজ হবে, ওয়াজিব পর্যায়ের নয়।

এরপর প্রশ্নকারী বলেন, কিছুলোক বলে, সম্ভ্রান্তলোকদেরকে কালেমা না পড়ানো উচিত। নিম্নশ্রেণীর লোকদেরকে কালেমা পড়ানো উচিত। যেমন, বেদে, যাযাবর ও কসাই। যারা অজ্ঞতার কারণে কুফরিবাক্য উচ্চারণ করে ফেলে কিন্তু বুঝতে পারে না। উত্তরে তিনি বলেন, না, বরং আজ অভিজাত শ্রেণীকেও কালেমা পড়ানো উচিত। কেননা তারা বড়ো অসংযত। মনে যা চায় বলে দেয়। তারা আল্লাহ ও রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কেও ছাড় দিয়ে কথা বলে না। এজন্য তাদের ইমানের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

[মাকালাতে হেকমতঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৯১]

তিনবার প্রস্তাব-কবুল বলানো ও আমিন পড়ানো

প্রশ্ন : বিয়েতে তিনবার প্রস্তাব ও কবুল বলানোর বিধান কী? ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা না-কি মোস্তাহাব?

উত্তর : কিছুই না। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৩৬]

বিয়েতে আমিন পড়ানো সম্পূর্ণ অনর্থক কাজ।

[হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৯]

বিয়ের অনুষ্ঠানে খোরমা ছিটানো

রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত ফাতেমা [রাদিয়াল্লাহ আনহা]-এর বিয়েতে একপাত্র খেজুর বিতরণ করেন।

এই হাদিসকে ইমাম জাহাবি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ও অন্যান মোহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। এটা খুব বেশি হলে মোস্তাহাব হবে কিন্তু শরিয়তের বিধান হলো যখন কোনো মুবাহ কাজে [যা করলে পাপ বা পুণ্য কোনোটাই হয় না] বা মোস্তাহাব কাজে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন তা ছেড়ে দেয়াই কল্যাণকর। এর থেকে জানা যায়, অধিকাংশ সময় খেজুর ছিটানোয় কষ্ট হয় এবং বার বার ছিটাতে হয়। সুতরাং তা বিতরণে সীমাবদ্ধ করবে। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৯১]

খোরমা হওয়া আবশ্যক নয়

একবিয়েতে খোরমা ছিটানো হয়। তখন হজরত থানভি [রাহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, খোরমা নির্দিষ্ট সুন্নত নয়। যদি কিসমিসও বিতরণ করা হয় তাহলেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। এখানে যেহেতু খোরমা ছিলো তাই তা বিতরণ করা হয়েছে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮৮]

হজরত গাঙ্গুহি [রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর ফতোয়া

বিয়ের সময় খোরমা ছিটানো বৈধকাজ। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে তা ছিটানো উচিত নয়। কেননা এমন কোনো প্রাসঙ্গিক কাজ করা উচিত নয় যা দ্বারা উপস্থিত লোকদের কষ্ট হয়। যদিও খোরমা ছিটানো বৈধ কিন্তু হাদিসের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা বর্ণনাকারীর অধিকাংশ বর্ণনা মিথ্যা প্রমাণিত। আর মসজিদে বিয়ে হয় তাহলে তা মসজিদের অসম্মান। দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করতে গিয়ে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া এবং মসজিদের অসম্মান হয় এমন কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। হাদিসটি বর্ণনাকারীগণ এটি দুর্বল লিখেছেন।

[ফতোয়ায়ে রশিদিয়া: পৃষ্ঠা: ৪৫৯ ও ৪৬৭]

মহর

অধ্যায় ।১১।
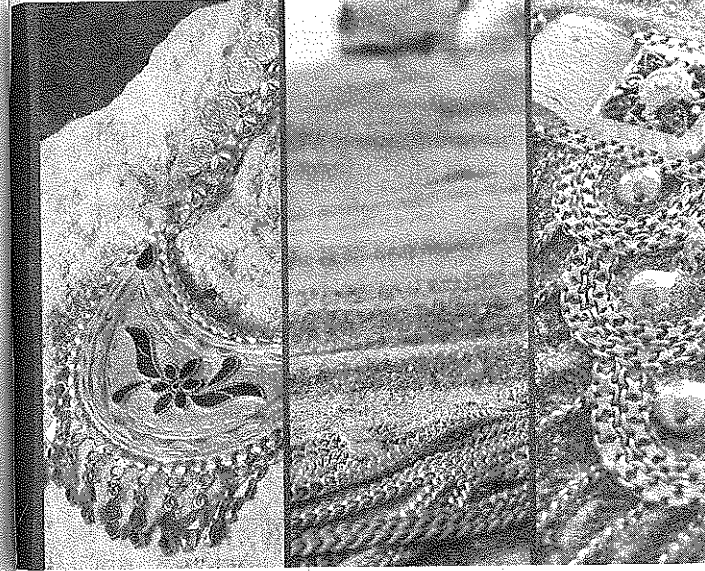
মহর নির্ধারণের রহস্য

বিয়েতে মহর নির্ধারণের নিয়ম করা হয়েছে, যাতে স্বামী বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকে এবং এমন কোনো প্রয়োজনে যখন তখন স্বামী অনন্যোপায় ছাড়া নারীর ওপর অবিচার না করে। এজন্য মহর নির্ধারণে একধরনের বাধ্যবাধকতা আছে। মহর দ্বারা বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। এজন্য রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] পূর্ববর্তী প্রথার মধ্য থেকে মহর নির্ধারণের প্রথাটি যথারীতি রেখে দিয়েছেন।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ২১০]

সাক্ষী নির্ধারণের রহস্য

সব নবি [আলায়হিস সালাম] ও ইমামগণ এ কথার ওপর একমত যে, বিয়ের প্রচার করতে হবে। যাতে উপস্থিত মানুষের সামনে বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। এজন্য সাক্ষী নির্ধারিত হবে। অধিক প্রচারের জন্য ওলিমা অনুষ্ঠান [বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] করা হবে এবং মানুষকে সেখানে দাওয়াত দেয়া হবে। সেখানে বিয়ের কথা প্রকাশ করা হবে এবং বলা হবে অন্যদেরও জানাতে যাতে পরে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ২১১]

মহর সম্পর্কে সাধারণ মানসিকতা ও মারাত্মক ভুল

একটি মারাত্মক ভুল হলো অধিকাংশ মানুষ মহর আদায় করার ইচ্ছাই রাখে না। চাই স্ত্রী আদায় করে নেয়ার ইচ্ছা রাখুক বা না রাখুক। তালাক বা মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ আদায়ের চেষ্টা করুক বা না করুক-কোনো অবস্থাতেই স্বামী আদায়ের ইচ্ছা রাখে না। মানুষের দৃষ্টিতে এটা অতিসাধারণ লেনদেন। এমনকি মহর কম-বেশি করার আলোচনার সময় অসঙ্কোচে বলে ফেলে, মিয়া! কে দেয় আর কে নেয়? তারা সরাসরি বলে, মহর শুধু নামের জন্যই। আদান-প্রদানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১২৭]

যে মহর আদায়ের ইচ্ছা রাখে না সে ব্যভিচারী

খুব ভালো করে মনে রাখা প্রয়োজন, মহরকে হালকা করে দেখা এবং তা আদায়ের ইচ্ছা না রাখা মারাত্মক বিষয়। হাদিসশরিফে এ ব্যাপারে অনেক হুঁশায়ারি এসেছে।

'কানজুলউম্মাল' ও 'বায়হাকি' গ্রন্থেদ্বয়ে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "যেব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ে করলো এবং তার মহর বাকি রাখলো, এরপর সে ইচ্ছা করলো মহর আংশিক বা একেবারেই আদায় করবে না তাহলে সে ব্যভিচারী হয়ে মারা যাবে এবং আল্লাহর সঙ্গে ব্যভিচারী হিসেবে সাক্ষাৎ করবে।"

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১২৭; কানজুল উম্মালঃ খণ্ডঃ ৮, পৃষ্ঠাঃ ২৪৮]

যে মহর আদায় করে না সে প্রতারক ও চোর

এ হাদিসের একটি অংশ হলো, 'যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কোনো পণ্য কিনে এবং তার মূল্য পরিশোধের ইচ্ছা না রাখে অথবা কারো ওপর কিছু ঋণ আছে সে তা আদায়ের ইচ্ছা রাখে না তাহলে ওইব্যক্তি মৃত্যুর সময় ও কেয়ামতের দিন প্রতারক চোর হিসেবে চিহ্নিত হবে।' মহরও একপ্রকার ঋণ। কেউ যদি তা আদায়ের ইচ্ছা না রাখে তাহলে হাদিসের দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী সে ব্যক্তি প্রতারক-চোর বিবেচিত হবে। তাহলে এমন ব্যক্তির দু'টি অপরাধ প্রমাণ হয়। **এক.** ব্যভিচার; **দুই.** প্রতারণা ও চুরি। এরপরও কি ভুল সংশোধন যোগ্য নয়? [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১২৭]

উত্তমচিকিৎসাঃ মহর কম নির্ধারণ করা

এর উত্তমচিকিৎসা হলো, মহর আদায় করার পুরোপুরি ইচ্ছা রাখবে। আর অভিজ্ঞতার দাবি হলো, মানুষ আদায়ের ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে তখন করে যখন তা তার সাধ্যের মধ্যে থাকে। নয়তো তা খেয়ালে পরিণত হয়, বাস্তবায়িত হয় না। কারণ, যেব্যক্তির শত টাকা আদায়ের ক্ষমতা নেই সে স্বাভাবিকভাবেই এক লাখ, সোয়া লাখ বরং সে পাঁচ-দশ হাজার টাকা পরিশোধেরও সামর্থ রাখে না। যখন সে সক্ষম নয় তখন সে আদায়ের নিয়ত না রাখার কারণে হুঁশিয়ারির পাত্র হবে। এজন্য সাধ্যের অতিরিক্ত মহর নির্ধারণ থেকে বিরত থাকা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। যেহেতু অধিকাংশ সময় বেশির ভাগ মানুষের সামর্থ কম থাকে। তাই উত্তম ও সহজপথ হলো মহর কম নির্ধারণ করা।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১২]

প্রমাণ

ইসলামি শরিয়তে সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বিষয় মাথায় চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদিসশরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قَالُوْا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَحَمَّلُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُهُ

"কোনো মোমিনের জন্য উচিত নয় নিজেকে অপদস্থ করা। সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে নিজেকে অপদস্থ করে? তিনি বলেন, সাধ্যাতীত বিপদ নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া।"

এ হাদিসের আলোকে সাধ্যের অতিরিক্ত মহর নির্ধারণ না করা এবং তা কম হওয়া শরিয়তের কাম্য প্রমাণিত হয়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩০]

মহর নির্ধারণ সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস

হাদিসে মহর বেশি হওয়াকে অপছন্দনীয় এবং কম নির্ধারণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

১. হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] খুতবাতে বলেছেন, মহর অতিরিক্ত নির্ধারণ করো না। কেননা তা যদি পৃথিবীতে সম্মানের বিষয় হতো অথবা আল্লাহর কাছে খোদাভীরুতার বিষয় হতো। আর এর সবচেয়ে বেশি দাবিদার ছিলেন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]। কিন্তু রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কোনো স্ত্রী বা কন্যার মহর বারো উকিয়া থেকে বেশি ছিলো না। এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম। এক দিরহাম সমান চার আনা চার পয়সা। অর্থাৎ রুপার চার আনা চার পয়সা। [কানজুল উম্মাল: পৃষ্ঠা: ২৯৭]

২. হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'মেয়েদের বরকতপূর্ণ হওয়ার একটি দিক হলো তাদের মহর সহজ বা কম হওয়া।' [কানজুল উম্মাল: পৃষ্ঠা: ২৩৯]

৩. অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'সহজ মহর নির্ধারণ করো।'
[কানজুল উম্মাল: পৃষ্ঠা: ২৪৯]

৪. অন্যহাদিসে এসেছে, 'উত্তমমহর হলো যা সহজ ও কম হয়।'
[ইসলাহে ইনকিলাব; পৃষ্ঠা: ১২৯]

মহর বেশি নির্ধারণের কুফল

এছাড়াও অধিক মহর নির্ধারণের অনেক জাগতিকক্ষতি রয়েছে যা সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, অনেক জায়গায় স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হয় না। স্ত্রীর

অধিকার আদায় করা হয় না। কিন্তু মহর অধিক হওয়ার কারণে তালাকও দেয় না। মানুষ তা আদায়ের জন্য অস্থির হবে। এখানে অধিক মহর মহিলার উপকারের পরিবর্তে কষ্টের কারণ হয়েছে।

অধিক মহর নির্ধারণের একটি কুফল হলো, তা আদায় করা হয় না এবং আদায় করার ইচ্ছাও রাখে না।

স্বামী যদি খোদাভীরু হয় এবং বান্দার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে চায়, তো মহর আদায়ের ইচ্ছা করে। তখন বিপদ হয়, এতোটা আদায় করা তার সাধ্যে থাকে না। ফলে দুশ্চিন্তার বোঝা তার ওপর চেপে বসে। সে অল্প অল্প করে আদায় করে। কিন্তু পরিমাণে বেশি হওয়ার কারণে তা শেষ হয় না। সে নানা রকম সংকট ও সমস্যা সহ্য করে। তখন মনে সংকীর্ণতা ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়। আর যেহেতু সব কষ্টের কারণ মহিলা তাই তার ব্যাপারে মন অনুদার হয়ে পড়ে। এরপর তা থেকে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এরপর শত্রুতা। সবকিছুর মূলে রয়েছে অধিক মহর নির্ধারণ।

একটি হাদিস

একটি হাদিসের ভাষ্য এমনই। বর্ণিত হয়েছে–

تَيَاسَرُوْا فِي الصَّدَاقِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذٰلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيْكَةً

"মহরের ক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করো। কেননা পুরুষ নারীকে অধিক মহর দেয়। আর এর দ্বারা পুরুষের মনে মহিলার প্রতি শত্রুতা জন্ম নেয়।"
[কানজুল উম্মাল: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৪৯]

হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর অভিজ্ঞতা

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হলো, আমার একস্ত্রীর মহর ছিলো পাঁচ হাজার টাকা। অন্যস্ত্রীর মহর ছিলো পাঁচশো টাকা। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মহর আদায় করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম মহর আদায়ের জন্য যে উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে, যদি আমার প্রয়াত পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ আমাকে সাহায্য না করতো তাহলে তা আদায় করা কষ্টকর হতো। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মহর দৈনন্দিন আয় বা হাদিয়া থেকে খুব সহজে আদায় হয়ে গেছে। মনে চিন্তার কোনো বোঝা সৃষ্টি হয়নি।

স্বামীর চেষ্টার পরও যদি আদায় না হয় তখন অপরের প্রতি হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়। আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী হলে স্ত্রীর কাছ থেকে মহর মাফ করিয়ে নেয়া। এমন আবেদন করাই লজ্জামুক্ত নয়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৩]

সাধ্যের বেশি মহর নির্ধারণের পরিণতি

অনেক জায়গায় তালাক বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মহর দাবি করা হয়। যেহেতু লাখ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে তাই সব সম্পদ মহর বাবদ চলে যায়। তখন স্বামী বা ওয়ারিশগণ দেউলিয়া হয়ে যায়। একবেলার খাবার পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাত দুই-ই নষ্ট হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩২]

বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক এড়ানোর জন্য অধিক মহর নির্ধারণ

অনেক বুদ্ধিমান লোক অতিরিক্ত মহর নির্ধারণে এই উপকার মনে করে যে, স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পারবে না। কিন্তু মহর কম হলে স্বামী কোনো চাপে পড়বে না। ছেড়ে দিতে কোনো বাধা থাকবে না। তখন তাকে ছেড়ে অন্যকে বিয়ে করবে। মহর বেশি হলে একটি প্রতিবন্ধকতা থাকে। এই ধারণা অমূলক। যার ছাড়ার প্রয়োজন সে ছেড়েই দেবে, যাই হোক না কেনো।

দ্বিতীয়ত ছেড়ে না দেয়া সবক্ষেত্রে কল্যাণকর নয়। কারণ, যেব্যক্তি মহরের ভয়ে ছেড়ে দেয় না সে ছাড়ার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট কাজ করে। অর্থাৎ তালাকের স্থলে ঝুলিয়ে রাখে। তালাক দেয় না কিন্তু কোনো অধিকার আদায় করে না। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই তাকে কে কী করতে পারে? তখন কোনো কিছুতে তার বাঁধে না। এমন ঘটনা কি চোখে পড়ে না, বড়ো বড়ো অঙ্কের ধার-কর্জ নেয় তবু স্ত্রীর কোনো অধিকার আদায় করে না। এমন অত্যাচারীর কেউ কিছু করতে পারে না। হয়তো প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ার কারণে তাকে ভয় পায়। অথবা তার কোনো সম্পদ থাকে না যে, জেলে পাঠিয়ে কোনো কিছু আদায় করবে। এছাড়াও জামাই জেলে গেলে নিজের মেয়ে কতোটা আরামে থাকতে পারবে? [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা: ১৩৫]

মহর কম হলে অসম্মানের ভয়

অনেক লোক বেশি মহর নির্ধারণে যুক্তি দেন, কম মহর অপমানকর। মহর বেশি হওয়া সম্মানজনক। প্রথম বিষয়টি হলো, কম পরিমাণ ভারসাম্যপূর্ণ হলে তা অপমানকর নয়। দ্বিতীয়ত যুক্তি ঠিক থাকলেও বেশি মহর নির্ধারণে সমস্যা সীমাহীন। আর উপকার কখন গ্রহণ করা যায়? [যখন লাভের পাল্লা ভারি হয়]। তৃতীয়ত যদি অহংকারবশত আদায়ের সামর্থের প্রতি লক্ষ না করা হয় তাহলে আমার শিক্ষকের কথা এই পরিমাণে কেনো থেমে থাকবে? তাহলে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ নির্ধারণ করে সম্মান ও গরিমা অর্জন করবে। উত্তম হলো, সাত

মহাদেশের অর্জিত সম্পদ ও ধনভাণ্ডার; বরং তার কয়েক গুণ নির্ধারণ করবে। আদান-প্রদান ব্যতীত শুধু নাম। তাহলে কেনো ভালোভাবে নাম করবে না। বাস্তবতা হলো, এগুলো সবই প্রথাপূজা ছাড়া কিছু নয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৫]

মূলকথা হলো, অহংকার ও গর্বপ্রকাশের জন্য এমনটি করা হয়। খুব মর্যাদা ও ভাব প্রকাশ পাবে। অহংকারের জন্য কোনো বৈধকাজ করাও হারাম। আর যদি তা নিজেই সুন্নতবিরোধী বা মাকরুহ হয় তাহলে আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হবে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৯]
মহর বেশি নির্ধারণের প্রথা সুন্নতবিরোধী। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৯]

মহর কম-বেশি নির্ধারণের মাপকাঠি

এখন কথা হলো এই কমের কোনো সীমা আছে কী-না? ইমাম শাফি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতে কমের কোনো সীমা নেই। সামান্য থেকে সামান্য পরিমাণও মহর হতে পারে। শর্ত হলো, তা মূল্যমান হতে হবে। চাই তা একপয়সা হোক। অর্থাৎ যা শরিয়তের দৃষ্টিতে মাল হতে পারে তাই মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন, সোনা, রুপা, টাকা, পয়সা ইত্যাদি। শুকর ও মদ শরিয়তের দৃষ্টিতে মাল নয়।

ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন সীমা দশ দিরহাম। এর থেকে কম মহর নির্ধারণ করা জায়েজ নয়। যদি দশ দিরহাম থেকে কম নির্ধারণ করা হয় তাহলে দশ দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব। দশ দিরহাম বর্তমান সময়ের তোলা অনুযায়ী ৩৪ গ্রাম রুপা হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩০]

আমাদের উদ্দেশ্য মহর খুব বেশি-কম হওয়া নয় বরং উদ্দেশ্য হলো এতো বেশি না হওয়া যা তার দীন-দুনিয়ার ধ্বংসের কারণ হবে। আদায়ের ইচ্ছা না থাকলেও। আদায়ের চেষ্টা করলেও বা দায়িত্বমুক্ত হওয়ার উপায় খুঁজলেও বরং ভারসাম্যপূর্ণ মহর নির্ধারণেই সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত।

সুন্নত হলো, দেড়শো রৌপ্যমুদ্রা নির্ধারণ করবে। তবে কারো যদি আরো বেশি আগ্রহ থাকে তাহলে প্রত্যেকের সামর্থ অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৯]

মহরেফাতেমি

মহরেফাতেমি যথেষ্ট এবং বরকতপূর্ণ। যদি কারো সাধ্য না থাকে তাহলে আরো কম নির্ধারণ করা উচিত। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৯]

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর মহর অন্যান্য মেয়েদের মতো সাড়ে বারো উকিয়া ছিলো। এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম। এই মোট পাঁচশো দিরহাম হয়। আমি একবার একদিরহামের হিসেব বের করেছিলাম। ইংরেজি মুদ্রা অনুযায়ী চার আনা চার পয়সা হয়। এই হিসেবে পাঁচশো দিরহাম এবং আরো কিছু পয়সা হয়। বর্তমান হিসেবে এক কিলো পাঁচশো একত্রিশ গ্রাম রুপা হয়।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯৪]

মহর কম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সতর্কতা

একজনের প্রশ্নের উত্তরে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, মহর কম নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো সব আত্মীয় একত্রিত হয়ে মহর কমাবে। নয়তো প্রচলিত মহর মেয়ের অধিকার। অভিভাবক তা কমিয়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার অধিকার রাখে না। [আল ইফাজাত: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩২]

যেসব অবস্থায় অভিভাবকের জন্য প্রচলিত মহরের চেয়ে কম পরিমাণ নির্ধারণ করা নাজায়েজ যেমনটি ফিকহি মাসায়েলে উল্লেখ আছে, সেসব অবস্থায় মহর কমানোর পদ্ধতি হলো, সব আত্মীয় একমত হয়ে তাদের প্রথা পাল্টাবে। যাতে কম মহরই প্রচলিত মহর হিসেবে বিবেচিত হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ১৩৫]

মহর আদায়সংক্রান্ত বিধান

টাকার স্থলে বাড়ি ইত্যাদি দেয়া

এটি স্বামীরা করে থাকে; নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্ত্রীকে কোনো জিনিস যেমন, অলঙ্কার, আসবাবপত্র, বাড়ি, জমি ইত্যাদি দেয়। তার নামে নিজে নিয়ত করে–আমি মহর দিয়েছি বা মহর আদায় করেছি।

ভালো করে বুঝে নিন! মহরের পরিবর্তে এসব জিনিস দেয়া ক্রয়-বিক্রয়ের শামিল। আর ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি আবশ্যক। যদি এসব জিনিস মহরের পরিবর্তে দিতে হয় তাহলে স্ত্রীকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে 'আমি মহর হিসেবে তোমাকে এসব জিনিস দিতে চাই তুমি রাজি?' যদি স্ত্রী রাজি হয় তাহলে জায়েজ। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ১৩৭]

মহর আদায়ের জন্য আগেই নিয়ত করতে হবে

প্রশ্ন: জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, যদি আদায়ের সময় নিয়ত না করে তাহলে যতোক্ষণ আদায়কৃত বস্তু দরিদ্রব্যক্তির হাতে থাকবে ততোক্ষণ জাকাতের নিয়ত করে নেয়ার সুযোগ আছে। এমনিভাবে যদি স্ত্রীকে মহর দেয়ার সময় নিয়ত না করে তবে কি জাকাতের মতো স্ত্রীর হাতে বস্তুটা থাকার সময়ের মধ্যে নিয়ত করা জায়েজ হবে? নিয়ত করার দ্বারা মহর আদায় হবে না-কি আবার আদায় করতে হবে?

উত্তর: যদি দেয়ার সময় নিয়ত না করে তাহলে তা উপহার হয়ে যায়। তার দ্বারা ঋণ বা দায়মুক্তি হয় না। 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, একবার উপহার হওয়ার পর তা পুনরায় মহর হয় না।

وَلَوْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةً عِنْدَ الدَّفْعِ غَيْرَ جِهَةِ الْمَهْرِ

জাকাত এর বিপরীত। কারণ তা নিজেই এক প্রকার দান। উপহারও দান। তাই জাকাতের নিয়ত করলে বস্তুটা দান হওয়া থেকে বের হয়ে যায় না। এজন্য জাকাত আদায় হবে কিন্তু মহর আদায় হবে না।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯৪]

সোনা-রুপা দ্বারা মহর আদায় করলে কোন সময়ের মূল্য ধরা হবে

মূল্যনির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ মাসয়ালা জানা আবশ্যক। যদি আদায় করা ওয়াজিব হয় একবস্তু এবং গ্রহণ করার সময় অন্যবস্তু দ্বারা তার মূল্য

নির্ধারণ করা হয় তাহলে যতোটা সে সময়ে আদায় করা হবে শুধু ততোটার হিসেব করা হবে। বাকি অংশ যদি একই বস্তু দ্বারা আদায় করা হয় তাহলে তা দ্বিতীয়বারের বাজারমূল্য অনুযায়ী আদায় করা হবে। প্রথমবারের বাজারমূল্য অনুযায়ী আদায়ে বাধ্য থাকবে না।

যেমন, একজন কৃষকের দায়িত্বে চল্লিশ সের গম ঋণ রয়েছে। পরে সিদ্ধান্ত হয়, নগদ অর্থে তা আদায় করা হবে। হিসেবের সময় এক টাকায় দশ কেজি গম পাওয়া যেতো। এই হিসেবে মোট দাম আসে চার টাকা। এখন যদি ওই বৈঠকে চার টাকা আদায় করা হয় তাহলে পুরো পণ্যের হিসেব করা জায়েজ। আর যদি সিদ্ধান্ত হয় দুই টাকা আদায় করা হবে তাহলে কেবল বিশ সেরের হিসেব করতে হবে। অবশিষ্ট বিশ সের কৃষকের দায়িত্বে ঋণ থাকবে। সামনে যখন তা আদায় করবে সে সময়ের বাজারমূল্য অনুযায়ী তা আদায় করতে হবে। প্রথম বাজারদরের হিসেব করা যাবে না। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৪২]

স্ত্রীর কাছ থেকে মহর মাফ করিয়ে নেয়া লজ্জাকর ও দোষণীয়

মহর মাফ করিয়ে নিলে অন্তরে এক ধরনের হীনমন্যতা তৈরি হয়। যা আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী। কারণ, মহর মাফ করানোর জন্য তার কাছে আবেদন করতে হয়। যা লজ্জামুক্ত নয়।

যদিও স্ত্রীর জন্য ক্ষমা করে দেয়া বৈধ কিন্তু অপছন্দনীয় কাজ।

لِكَوْنِهِ اَبْعَدَ مِنَ الْغَيْرَةِ

"কেননা তা আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী।"

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"তোমরা পরস্পরের মর্যাদাকে ভুলো না।"

আমি এই দিকে ইঙ্গিত করেছি। বরং আত্মমর্যাদাবোধের দাবি হলো, স্ত্রীর মহরমাফকে গ্রহণ না করা। এখানে তুমি তার প্রতি উত্তমআচরণটাই করবে। কেননা আত্মমর্যাদার দাবি হলো বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীর অনুগ্রহগ্রহণ না করা।

[আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩০১ ও হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩২]

প্রত্যেক ক্ষমাই গ্রহণযোগ্য নয়

ক্ষমা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তাতে স্ত্রীর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখবে। যদি আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে সঙ্গে খোদভীতিও চলে যায় তখন শুধু আক্ষরিক ক্ষমার নাজায়েজ পন্থাই প্রকাশ পাবে। হয়তো স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করবে নয়তো তাকে ধমকাবে বা চাপ সৃষ্টি করবে যাতে সে ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে,

এমন ক্ষমা আল্লাহর কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর কাছে ঠিকই দায়িত্বের বোঝা বাকি থেকে যাবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৪]

অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীর মহর মাফ হয় না

অনেক মানুষ তালাক দেয়ার সময় বা এমনিতেই অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীর কাছ থেকে মহর মাফ করিয়ে নেয়। এমন ক্ষমা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইসলামিশরিয়তের বিধান হলো, لَانَّ التَّبَرُّعَ بَاطِلٌ –ছোটোবাচ্চাদের দায়মুক্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি অভিভাবক বাবা বা চাচা ক্ষমা করে দেয় তবুও তা মাফ হয় না।

মহর নারীর অধিকার, তা চাওয়া দোষের নয়

একটি প্রচলিত ভুল হলো, নারীরা মহর চাওয়া বা চেয়ে নেয়াকে দোষের মনে করে। যদি কেউ এমন করে তাহলে তার বদনাম হয়। মনে রাখা উচিত, নিজের অধিকার চাওয়া বা আদায় করা যখন শরিয়তের দৃষ্টিতে দোষের নয় তখন শুধু প্রথা-প্রচলনের কারণে তা দোষের ভাবা গোনাহমুক্ত নয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৯]

আরব ও ভারতের রীতি

আরবের রীতি হলো নারীরা পুরুষের বুকের ওপর উঠে মহর আদায় করে। কিন্তু ভারতবর্ষে এটাকে বড়ো দোষের মনে করা হয়। ভারতবর্ষের নারীরা মহরের কথা মুখেই আনে না। অধিকাংশ নারীই স্বামীর মৃত্যুর সময় তা ক্ষমা করে দেয়। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫১]

ন্যায্য ভরণ-পোষণ মাফ হয় না, অধিকার শেষ হয় না

মহিলারা মনে করে, আমরা যদি মহর নিয়ে নিই তাহলে স্বামীর দায়িত্ব থেকে আমাদের সব অধিকার শেষ হয়ে যাবে। ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য জাগতিক অধিকার শেষ হয়ে যাবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। প্রত্যেক অধিকার ভিন্ন ভিন্ন। একটি অপরটির ওপর নির্ভশীল নয়। মহর নেয়ার কারণে অন্যকোনো অধিকার শেষ হয়ে যায় না। অনেক নারীর ধারণা, যদি আমরা মহর আদায় করে নেই তাহলে ভরণ-পোষণের অধিকার হারাবো। এজন্য তারা চাওয়া তো দূরের কথা অনেক নারী স্বামী আদায় করতে চাইলেও ভয়ে গ্রহণ করে না। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তবিশ্বাস। যার ফল হলো, একদিকে স্বামী আদায় করতে চায় অন্যদিকে স্ত্রী গ্রহণ করে না এবং ক্ষমা করে না। এখন যদি স্বামী দায়িত্ব আদায়ে প্রবল

আগ্রহী হয় তখন সে চিন্তায় পড়ে যায়– কীভাবে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৯]

স্ত্রী মহর গ্রহণ বা মাফ না করলে উপায়

প্রশ্ন: যদি কোনো মহিলা তার মহর গ্রহণও না করে আবার ক্ষমাও না করে তখন স্বামীর দায়মুক্তির উপায় কী?

উত্তর: এমন অবস্থায় স্বামীর মহরের নির্ধারিত বস্তু বা অর্থ স্ত্রীর সামনে এমনভাবে রেখে দেবে যাতে সে ইচ্ছা করলেই গ্রহণ করতে পারে; এবং 'এটা তোমার মহর' বলে স্থান ত্যাগ করবে। তাহলে মহর আদায় হয়ে যাবে। স্বামী দায়মুক্ত হবে। তখন যদি স্ত্রী তা গ্রহণ না করে এবং অন্যকেউ তা নিয়ে যায় তাহলে তার সম্পদ নষ্ট হবে। এতে স্বামীর কোনো দায় থাকবে না। তবে স্বামী যদি তা সংরক্ষণের জন্য রেখে দেয় তাহলে তা স্বামীর কাছে আমানত হিসেবে গচ্ছিত থাকবে। তখন স্বামী তার মালিক হবে না এবং খরচ করাও বৈধ হবে না।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০৩ ও ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৯]

স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রীর মহর মাফ করা

একটি ভুল হলো, স্বামীর মৃত্যুশয্যায় স্ত্রী তার মহর ক্ষমা করে দেয়। তার বিধান হলো, স্ত্রী যদি খুশি মনে ক্ষমা করে তাহলে ক্ষমা হবে। আর চাপ প্রয়োগ করে মাফ করিয়ে নিলে আল্লাহর কাছে মাফ হবে না। বুড়া-বুড়িকে এভাবে বাধ্য করা ঠিক নয়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৭]

স্বামীর মৃত্যুর পর মহর মাফ করার বিধান

স্বাভাবিকভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর মহর ক্ষমা করে দেয়া উত্তম মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে আদায় করে নেয়াই উত্তম। কেননা স্বামীর উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা চাওয়ার প্রতি লালায়িত থাকে যা দোষণীয়। আর ক্ষমা চাওয়াটা সেই দোষণীয় কাজকেই সাহায্য করে।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০৪]

অনেক ক্ষমা করা কল্যাণকর হয় না। যেমন, স্বামী থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ তার ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যান্য ওয়ারিশদের থেকে সাহায্য সহযোগিতারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তখন ক্ষমা করার চেয়ে না করাই উত্তম। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৮]

মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর ক্ষমাগ্রহণযোগ্য নয়

অধিকাংশ মহিলা তার মৃত্যুর সময় মহর ক্ষমা করে দেয়। এতে স্বামী পুরোপুরি ভাবনাহীন হয়ে পড়ে। খুব ভালো করে বুঝুন! এই ক্ষমা [একজন] ওয়ারিশের জন্য [বিশেষ কিছু] অসিয়ত করার মতো। যা অন্যান্য ওয়ারিশের সন্তুষ্টি ছাড়া নাজায়েজ। সুতরাং এমন ক্ষমার দ্বারা মহর মাফ হবে না। তবে স্বামী উত্তরাধিকারসূত্রে যতোটুকু

পাবে তা মাফ হয়ে যাবে। বাকিটা তার দায়িত্বে পরিশোধ করা ওয়াজিব থাকবে, যা অন্যান্য ওয়ারিশদেরকে দেয়া হবে। যদি সব ওয়ারিশ ক্ষমা সমর্থন করে তাহলে ক্ষমা হয়ে যাবে। যদি ওয়ারিশদের কয়েকজন ক্ষমা করে এবং কয়েকজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে তাদের অংশ মাফ হবে না। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৭]

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ মহরের দাবিদার

মৃতস্ত্রীর ওয়ারিশ যদি তার পিতা-মাতা, ভাই ইত্যাদি হয় তখন তারা মহরের অংশ দাবি করে এবং স্বামী তা আদায় করে দেয়। কিন্তু যদি তার সন্তান ওয়ারিশ হয় তখন তারা ছোটো হওয়ার কারণে যেহেতু দাবি করতে পারে না। তাই স্বামী তাদের অধিকার আদায় করে না। এটা অবিচার ও প্রতারণার শামিল। সন্তানদের অংশ আমানত। তা তাদের নামে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। তাদের বিশেষ প্রয়োজনে খরচ করবে। নিজের কাজে খরচ করা হারাম। এমনিভাবে এসব সন্তান তাদের মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছে তা-ও আমানত। সংরক্ষণ করা বাবার জন্য ফরজ। অনর্থক খরচ করা হারাম। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৮]

মহর জাকাতকে বাধা দেয় না

অনেক মানুষ মহরের ঋণকে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক মনে করে। তারা মনে করে যেহেতু আমি [মহর বাবদ] এতো টাকা ঋণী তাই আমার এই পরিমাণ টাকায় জাকাত আসবে না। কিন্তু সঠিক মাসয়ালা হলো, মহর জাকাতকে বাধা দেয় না। আল্লামা ইমাম শামি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ "সঠিক মাসয়ালা হলো মহর জাকাতের জন্য প্রতিবন্ধক নয়।" [রদ্দুল মোখতার: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮]

অর্থাৎ মহরের ঋণ থাকার পরও স্বামীর ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। যদি তার নেসাব [জাকাত হওয়ার জন্য নির্ধারিত পরিমাণের সম্পদ] পরিমাণ সম্পদ থাকে। তবে অন্যদেয় মহর দ্বারা জাকাত ওয়াজিব হয় না যতোক্ষণ না তা আদায় করা হবে। আদায়ের পর বিগত দিনের জাকাত দিতে হবে না। শুধু নগদ জাকাত আদায় করলে হবে। 'দুররুল মোখতার' গ্রন্থে এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৮]